পীর হলে প্রাণ গেলে না পুজে হিন্দুর
অতএব সত্যপীর নারায়ণ নাম"।

সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি প্লাবনে এ দেশের ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। রাম রহিম কৃষ্ণ এ তিনই এক এ সকল মতও হিন্দুজাতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। অবতারবাদ ত সামান্য কথা। পবিত্র রামচরিত পাইয়া যিনি যাহা মনে করিয়াছেন, তাহাই তিনি খাড়া করিয়াছেন। বাল্মীকি ও অধ্যাত্ম রামায়ণত দেখিতেছেন আবার যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ খুলিয়া দেখুন রাম বাল-বৈরাগী, বিশ্বামিত্রের সহিত পঞ্চদশ বৎসর বয়সেই যোগ ও বৈরাগ্য সম্বন্ধে তাঁহার কথোপকথন। যোগবাশিষ্ঠে রামজীবনের ঘটনাবলীর মোটামোটী উল্লেখ আছে মাত্র, তদ্ভিন্ন ইহা যোগশাস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাই বলিতেছিলাম আধুনিক লেখকগণের হস্তে রামজীবন উপলক্ষ্য মাত্র। শুদ্ধ রাম যে এ দেশের শাস্ত্রকারগণের উপলক্ষ্য তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণও ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত। তাই জ্ঞানোন্নত সময়ে গীতার অবতারণা, ও সুকবির হস্তে অপেক্ষাকৃত এ দেশীয় হীনাবস্থার কালে জয়দেবের গীতি কাব্য। প্রকৃত পক্ষে রাম বা কৃষ্ণ কি ছিলেন তাহা নিশ্চয় করিতে হইলে বাল্মীকিকৃত রামায়ণ ও মহাভারত ভিন্ন অন্য গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ নিতান্তই বিড়ম্বনা।

সমালোচনা।

শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কৃত শাঙ্করভাষ্য সমেত সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্ম্য শাস্ত্রের অনুবাদ প্রাপ্ত হইলাম। যাঁহারা আমাদের দেশের পুরাতন দর্শনশাস্ত্রের সটীক সমাচার এবং নিগূঢ় রহস্য জানিতে সমুৎসুক, তাঁহারা বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের প্রণীত গ্রন্থাবলীতে দুয়েরই সন্ধান যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া সফল মনোরথ হইবেন সন্দেহ নাই। আমরা সিকি শতাব্দী ধরিয়া তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের পর গ্রন্থ আনুপূর্ব্বিক প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছি—অথচ এযাবৎকাল একথানিরও সমালোচনা করিতে পারিলাম না বলিয়া তাঁহার নিকটে ক্রমাগতই অপরাধী রহিয়া যাইতেছি। সুদ এবং তস্য সুদ জমিয়া জমিয়া তাঁহার নিকট আমাদের ঋণ ক্রমাগতই বাড়িয়া বাড়িয়া বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের অপরাধ নাই;—একে তো তাঁহার প্রণীত গ্রন্থগুলির অধিকাংশেরই বাহ্য অবয়বের গুরুত্ব নিতান্ত অবহেলার সামগ্রী নহে, তাহাতে আবার এক এক খানি গ্রন্থের অন্তঃসারের গুরুত্ব অপরাপর শত গ্রন্থের সমষ্টি-তুল্য অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিক। যখনি আমরা তাঁহার যে গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি তখনই আমরা তাহাতে এত মুগ্ধ হইয়াছি যে, দুই তিন মাস ধরিয়া আমরা তাহার ভিতরে ডুব দিয়া নানা বিধ বিচিত্র রত্ন সংগ্রহ করিতেই ব্যস্ত—'সমালোচনা' কথাটাই তখন আমাদের মন হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। আমরা ক্রমাগতই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি যে, বেদান্তবাগীশ মহাশয় এই যে গ্রন্থের পর গ্রন্থ অজস্রধারায় উৎসৃজন করিতেছেন—একাকী অসহায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়া কেমন করিয়া তিনি তাহা পারিতেছেন! লক্ষপতি কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং বৰ্দ্ধমানপতি মহাতাপচাঁদ মহাভারতের অনুবাদ ছাপাইলেন—তাঁহাদের পক্ষে তাহা সম্ভবে। কিন্তু বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের রাজ-কোষ অমর-কোষের অধিক নহে—তাঁহার অর্থ-সম্বল শব্দার্থ এবং ভাবার্থ এই দুয়ের মধ্যেই আবদ্ধ—এ অবস্থায় তিনি একাকী এত এত হৃষ্ট পুষ্ট এবং সারবান্ পুস্তক কেমন করিয়া বাহির করিতেছেন! বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের লেখনী অপূর্ব্ব স্পর্শ-মণি! কি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ—কি স্বাধীন প্রবন্ধ—যাহাতে যখন তিনি হাত দিয়াছেন তাহাকেই তিনি অকৃত্রিম অথচ চমৎকার শোভায় সজ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন। অকৃত্রিম বলিতেছি এই জন্য যে, অনেকে অনুবাদ্য বিষয়ের কোনো স্থান কঠিন দেখিলে কৃত্রিম একটা

অনুবাদ আপনার মস্তিক হইতে বাহির করিয়া তাহা অলক্ষিত ভাবে প্রণীয়মান গ্রন্থের মধ্যে চালাইয়া দে'ন ;—কিন্তু বেদান্তবাগীশ মহাশয় যেমন শাস্ত্রজ্ঞ তেমনি ধর্ম্মজ্ঞ ; তিনি এত যে ভূরি ভূরি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন—তাঁহার প্রণীত কোনো গ্রন্থের কোনো একটি স্থানে কৃত্রিম বাক্‌চাতুরী, অর্থের বিপর্য্যয় অথবা শব্দের অবৈধ প্রয়োগ আমরা আজ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম না। তিনি পরিশ্রম এবং প্রযত্ন সহকারে নানা শাস্ত্র ঘুঁটিয়া কাহার কোন্ খানে কোন্ কথার কিরূপ অর্থ এবং তাৎপর্য্য তাহা সবিশেষ বিচক্ষণতার সহিত অবধারণ করিয়া তাহাই আপনার গ্রন্থ-মধ্যে সুবোধ্য এবং সুপাঠ্য ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এই জন্য ইংরাজি দার্শনিক শব্দের অনুবাদের সময় বেদান্ত-বাগীশ মহাশয়ের দার্শনিক ভাষা অনুবাদ-কের বিশিষ্টরূপ কাজে লাগে। তাহার সাক্ষী "ঐন্দ্রিয়ক উপরাগ" এই একটি কথা। এক সময়ে,—sensation শব্দের বাঙ্গলা অনুবাদ কিরূপ লিখিলে ঠিক হইতে পারে—ইহা ভাবিয়া আমার (অ-র্থাৎ বর্ত্তমান সমালোচকের) মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল ; দৈবাৎ বেদান্ত বাগীশ মহাশ-য়ের কোনো একটি গ্রন্থে "ঐন্দ্রিয়ক উপ-রাগ" এই কথাটি দেখিয়া কি যেন একটি অমূল্য রত্ন হাতে পাইলাম ! বেদান্ত বা-গীশ মহাশয় ও-কথাটি নিজে গড়েন নাই, যাহা শাস্ত্রে আছে তাহাই তিনি লিখিয়া-ছেন, অথচ উহা sensation শব্দের কেমন বিশুদ্ধ অনুবাদ ! Sensation কিনা affection of the senses কি না বহির্বস্তুর গুণ দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলের উপরঞ্জন ; এক কথায় "ঐন্দ্রিয়ক উপরাগ"! "ঐন্দ্রিয়ক" বিশে-ষণটি ছাড়িয়া দিয়া সংক্ষেপে উপরাগ শব্দটি sensation অর্থে বেস্ চালানো যাইতে পারে। মনের রঞ্জিত বা (চালিত) অব-স্থাকে যেমন রাগ বলা যায়, মনের অধী-নস্থ ইন্দ্রিয় সকলের রঞ্জিত অবস্থাকে তে-মনি উপরাগ বলা যাইতে পারে। রাগ passion, উপরাগ sensation; দুইই মনের এক প্রকার চালিত অবস্থা—passivity—passion—বাহিরের বস্তু কর্ত্তৃক উপরঞ্জন—affected হওয়া—affection। এইরূপ, বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের গ্রন্থাবলীতে আরো অনেক কথা পাওয়া যায় যাহা ইউরোপীয় দর্শনের সহিত দেশীয় দর্শনের সাদৃশ্য-ব্যঞ্জক ; আবার এমনো অনেক কথা পাওয়া যায় যাহার স্পষ্ট উল্লেখ বিদেশীয় দর্শন-শাস্ত্রের কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না ; যেমন, সমাপত্তি—বিষয়াকারে বৃত্তি পরিণতি—ইত্যাদি। এই জন্য বলি যে, স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনে যাঁহারা সবিশেষ অনুরাগী—বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের প্রণীত গ্রন্থাবলীর ন্যায় এমন উপকারী এবং আশুফলপ্রদ গ্রন্থ তাঁহারা সহস্র চেষ্টা করিলেও অন্য কোথাও খুঁজিয়া পাইবেন না। আমাদের দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা এরূপ সারবান্ স্ব-দেশীয় গ্রন্থাবলীর সমাদর করিতে এখনো শেখেন নাই (প্রবাদই আছে যে, লোকে দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা জানে না) ; কালে যখন তাঁহাদের চক্ষু ফুটিবে তখন তাঁহারা বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে শত শত ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না। নূতন প্র-কাশিত সনৎ সুজাতীয় শাস্ত্রে কতিপয় সুন্দর দার্শনিক রহস্য বিবৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রধান একটি কথা এই যে, প্রমাদই মৃত্যু—দ্বিতীয় মৃত্যু নাই। এ কথাটি যে কত সত্য তাহা ভাঙিয়া বলি-বার স্থান এ নহে। আমরা এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বিরচিত গ্রন্থাবলীর অশেষ গুণ ব্যাখ্যা ক-রিয়া উঠিতে পারিব না জানিয়া এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম।

এই সঙ্গে শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব নামক ত্রৈমাসিক প-ত্রিকা প্রাপ্ত হইলাম। সীতানাথ বাবুকে আমরা সবিশেষ অনুরোধ করি যে, তিনি বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কৃত সাংখ্য পাত-ঞ্জল এবং বেদান্তের অনুবাদ ভাল করিয়া পাঠ করেন ; ইহাতে তাঁহার দার্শনিক

ভাষা বহুল পরিমাণে মার্জ্জিত হইবে। তিনি যে কথাটি প্রতিপাদন করিবার জন্য এত বাহুল্য রূপ চেষ্টা করিতেছেন—পঞ্চদশীর প্রথম অধ্যায়ে তাহা অতি সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে; তাহাও আমরা তাঁহাকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সীতানাথ বাবু তাঁহার পত্রিকাখানিকে মাসিক না করিয়া ত্রৈমাসিক করিয়াছেন—অতীব সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন; কিন্তু তাহা হইলেও এরূপ গুরুভারাক্রান্ত পত্রিকার অনেক জোগাড় যন্ত্র চাই—সীতানাথ বাবু দর্শন-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও একাকী তিনি কতদূর শেষ রক্ষা করিতে পারিবেন—এ বিষয়ে এখনো স্থির কিছুই বলা যাইতে পারে না। তাঁহার পত্রিকার প্রথম সংখ্যা যাহা বাহির হইয়াছে—তাহার আদ্যোপান্ত প্রায় একই প্রকার বিষয়ে পরিব্যাপ্ত; আমাদের বিবেচনায় পত্রিকাখানিকে পাঠকের প্রীতিপ্রদ করিতে হইলে লিখিত বিষয়ের মধ্যে বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপন নিতান্তই আবশ্যক। যাহাই হউক্ সীতানাথ বাবুর সংকল্প অতীব উচ্চ এবং তাঁহার উদ্যম এবং অধ্যবসায় সাধুবাদের যোগ্য তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৭, আষাঢ় মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৪৬১॥৶০
পূর্ব্বকার স্থিত ...	৩১৪১।৶৬
সমষ্টি	৩৬০৩৵৬
ব্যয় ...	৩০৭॥৶০
স্থিত ...	৩২৯৫।৶৬

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন চারকেতা	
গবর্ণমেণ্ট কাগজ ...	৩০০০৲
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত ...	২৮৮।৶৬
	৩২৯৫।৶৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৫২৲
মাসিক দান।	
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	১৪০৲
শুভকর্ম্মের দান	
শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
আনুষ্ঠানিক দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৲
	১৫২৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৯॥৶০
৺ বাবু জয়গোপাল সেন, কলিকাতা	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথঠাকুর (পাথুরে ঘাটা) ঐ	৩৲
" " দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, ঐ	২॥০
" " এচ্, সি, রাহা, ঐ	৩৲
" " চক্রধর সাহা, আমতা,	৩।৵০
" " যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী, জঙ্গিপুর,	৬৸০
" " সুকুমার হালদার, বর্দ্ধমান,	৩৲
" " কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস, ঝাজ্রি	১৸/০
" " রঘুনাথ নাথ, গোয়াড়ি	৩।৵০
" " চন্দ্রমোহন সাহা, ভাণ্ডারিয়া	১৸৵০
	২৯॥৶০
পুস্তকালয়	৭।/০
যন্ত্রালয়	২৭০৲
গচ্ছিত	১॥৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	১৲
সমষ্টি	৪৬১॥৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৬৪৸৵০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৮৸/৯
পুস্তকালয় ...	২০॥৯
যন্ত্রালয় ..	৯৩।৵৬
সমষ্টি	৩০৭॥৶০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আদি ব্রাহ্ম-সমাজের গৃহ-সংস্কার জন্য বিগত ১৮ই আষাঢ় বুধবার হইতে সাপ্তাহিক ও মাসিক ব্রহ্মোপাসনা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে হইতেছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দ্দশ কল্প।
দ্বিতীয় ভাগ।
আশ্বিন ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।

৬৩৮ সংখ্যা | ১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रय सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮১৮ শক। ৪ ভাদ্র।

"যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিব্যে"

বর্ষাকাল গত ও শরৎকাল সমাগত হইল। এই কাল কি মনোহর! কৃষ্ণ-বর্ণ মেঘ গগনমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছিল, এক্ষণে তাহাদের অপগমে ইহা কেমন সুন্দর বোধ হইতেছে। এ সময়কার রক্তবর্ণ নবোদিত সূর্য্য কিরণ গঙ্গাবক্ষে প্রতিফলিত হইয়া কাহার চিত্তকে না প্রফুল্লিত করে? শরতের চন্দ্রমা নক্ষত্রখচিত নীলাকাশে উদিত হইয়া কি অতুল শোভাই না বিস্তার করে! হৃদয়প্রফুল্লকর জ্যোৎস্নার কি অপরূপ মাধুর্য্য। ঐ দেখ প্রাণতোষিণী জ্যোৎস্না হরিৎবর্ণ বৃক্ষে, তৃণময় ক্ষেত্রে ও শুভ্র ভাগীরথী নীরে পতিত হইয়া মর্ত্ত্য লোকেই স্বর্গের শোভা বিস্তার করিতেছে। বিবিধ বর্ণের খণ্ড-মেঘ আকাশে পর্ব্বতশ্রেণীর ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। "নম শোভা জল স্থলে, তরুরাজি নব-দলে"। নব নদী সরোবরের কলুষিত জল নির্ম্মল হইয়াছে। সরসীবক্ষে কমল কহ্লার প্রস্ফুটিত হইয়া জল আলো করিয়াছে। হংসগণ তথায় ও নদী বক্ষে সন্তরণ করিয়া মহা সুখে সুমধুর কলরব করিতেছে। স্থলপদ্ম নাগকেশর সেফালিকা প্রভৃতি নানা জাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া চতুর্দ্দিকে গন্ধ বিস্তার করিয়া জীবগণের মনে আহ্লাদ সঞ্চার করিতেছে। কাশকুসুম বিকসিত হইয়া, হরিৎবর্ণ ক্ষেত্রে কি শোভাই ধারণ করিয়াছে, দেখিলে বোধ হয় সমুদ্র মধ্যে শ্বেতবর্ণ ফেনরাশি ইতস্ততঃ স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। যে দিকে নেত্রপাত করি, ধান্যমঞ্জরীর অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে পাই। সুমন্দ সুগন্ধযুক্ত মারুতে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া তাহারা যেন ভগবানের চরণ চুম্বন করিতেছে। শুকপক্ষী সকল ধান্যমঞ্জরী মুখে করিয়া অকাশ পথে উড্ডীন হইতেছে। এই কালকে লক্ষ্য করিয়া এক জন কবি বলিয়াছেন, "সুকাল শরৎকাল, সুপ্রেমের তিথি" কি সুমধুর কথা। সুপ্রেমের তিথিই বটে; ভগবৎ-

প্রেমপূর্ণ হৃদয় এ সময়ে সহজে যে উৎফুল্ল হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? তরুণ অরুণ-কিরণ ও নবোদিত সূর্য্যের সিন্দূর রাগ দেখিবা মাত্র তাঁহার হৃদয়াকাশের অনুরাগ দ্বিগুণিত হইয়া উঠে। তিনি যখন সরোবরের প্রফুল্ল কমলের নিকটস্থ হন, তখন তাঁহার হৃদয়-পদ্মও প্রস্ফুটিত হয়। তিনি বলিতে থাকেন, "পত্র পুষ্প ফলে, দেখি যে সব রেখা, রেখা নয় সে তোমার দয়াল নামটি লেখা"।

তিনি নির্ম্মল জল ও নির্ম্মল আকাশ দেখিয়া, পুনঃ পুনঃ নির্ম্মল পরমেশ্বরকে স্মরণ করেন। তিনি পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিয়া পুষ্পের অসামান্য রূপ মধ্যে ঈশ্বরের প্রেমরূপ দর্শন করিয়া মোহ প্রাপ্ত হন। নিশীথে নীলাকাশরূপ সুনীল সমুদ্রে যখন সোনার চাঁদ নিঃশব্দে ভাসিয়া যায়, তখন তাহার মধ্যে তিনি তাহার কাণ্ডারীকে নিরীক্ষণ করিয়া উদাসভাব প্রাপ্ত হন। রাজরাজেশ্বর যাঁর পিতা, তিনি তাঁর মহিমা ও ঐশ্বর্য্য চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া, পিতার গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে থাকেন। কেবল শরৎ কাল বলিয়া নয়, ঈশ্বরপ্রেমী এইরূপে সকল ঋতুতেই তাঁহার প্রেমাস্পদের আবির্ভাব, অন্তর বাহিরে অনুভব করিয়া সুখী হইতে থাকেন। শীতকালের প্রত্যূষে যখন তিনি শিশিরসিক্ত দূর্ব্বাদলপূর্ণ ক্ষেত্র দর্শন করেন, তখন তাঁহার মনে হয়, অন্তরীক্ষে সমস্ত রাত্রি দেবগণ যে প্রেমাশ্রুপাত করিয়াছেন, তাহাই মর্ত্ত্যধামে পতিত হইয়া মুক্তাকলাপকে পরাজিত করিয়াছে। শীতান্তে যখন বসন্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনও তাঁহার আনন্দ। দক্ষিণানিল সেবন করিয়া তাঁহার মনে হয়, করুণাময়ী মাতা যেন স্বহস্তে বীজন করিয়া তাঁহাকে অপার আনন্দে আনন্দিত করিতেছেন।

বকুল মুকুল উদ্গত হইলে যখন ভ্রমরেরা ঝঙ্কার করে, তখন তিনিও হৃদয়-তন্ত্রী বাজাইয়া ঐ ঝঙ্কারের সহিত যোগ দিয়া ভগবানের গুণ কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। বিহঙ্গমকুল তখন কত শত ফুলের মধুপানে মত্ত। তিনিও তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া পরমেশ্বরের পাদ-কমল-মধুপানে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া কৃতার্থ বোধ করেন। কোকিলের সুমধুর সুস্বর শুনিয়া আপনার জিহ্বা ও হৃদয়কে মধুময় ও অমৃতময় করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন।

গ্রীষ্মের সৌন্দর্য্যের মধ্যেও তিনি তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্য অনুভব করেন। তখনকার প্রত্যূষ ও প্রদোষ কি মনোহর। মধ্যাহ্নকালে যখন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড, উত্তপ্ত কিরণজালে ধরণীকে শুষ্ক বিশুষ্ক করিয়া ফেলে, যখন পক্ষী সকল নীরব, বন নিস্তব্ধ তখন ও তিনি সেই জ্বলন্ত অনল স্বরূপ তেজোময় পরমেশ্বরের রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে থাকেন।

বর্ষাকাল তাঁহার তপস্যার পক্ষে আরো অনুকূল। যখন তৃষিত মেদিনী জলধারা প্রাপ্ত হইয়া শীতল হয়, যখন ঘনঘটা আকাশমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে, রাত্রিকালে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ উদিত হইয়া যখন ক্ষিতি ও ব্যোমের বিশেষত্ব নষ্ট করে, যখন গভীর শব্দে মুষলধারে বারিধারা পড়িতে থাকে, যখন ঘন ঘন অশনিনির্ঘাৎ হইয়া অন্ধকারের গাঢ়তাকে আরো গাঢ়তর করিয়া তুলে, তখন তিনি তার মধ্যে কি গাম্ভীর্য্যই অনুভব করেন। তিনি সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে রোমাঞ্চিত শরীরে সেই অগম্য অপার ঈশ্বরের ধ্যানে

নিমগ্ন হইয়া, কি যে তৃপ্তিসুখ অনুভব করেন, তাহা তিনি ব্যতীত আর কে জানিতে পারে? এইরূপে যিনি তাঁহাকে দেখিতে চান, ভোগ করিতে চান, তাঁহার জন্য ঈশ্বর সর্ব্বত্রই সর্ব্বকালে প্রকাশিত রহিয়াছেন।

হে মনুষ্য! তুমি কার সৌন্দর্য্য পিপাসায় অস্থির হইয়াছ? যে সৌন্দর্য্য আজ আছে কাল নাই, যাহা উন্মীলিত হইয়াই নিমীলিত হয়, তাহার জন্য কেন এত ব্যাকুল হও।

যে সৌন্দর্য্য মলিন হইবার নয়, এমন যাঁর সৌন্দর্য্য তাঁর প্রেমে মগ্ন হও। তাঁহাকে অন্তর বাহিরে দেখ, এই সুন্দর প্রকৃতির মধ্যে তাঁহাকে অনুক্ষণ দেখ, এই আত্মার মধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া জীবনের ফল লাভ কর। বল, উৎসাহের সহিত বল,

"নাথ হে প্রেমপথে সব বাধা ভাঙ্গিয়া দাও।
মাঝে কিছু রেখো না, থেকো না দূরে॥
নির্জ্জনে সজনে, অন্তরে বাহিরে,
নিত্য তোমারে দেখিব"॥

যদি এই প্রকার পিপাসাতুর হইয়া ব্যাকুল অন্তরে ডাকিতে পার, তবে নিশ্চয়ই ভগবান তোমাকে নির্জ্জনে সজনে সর্ব্বকালে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিবেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সত্যলাভের উপায়।

করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে যত প্রকার রত্নের অধিকারী করিয়াছেন, তন্মধ্যে সত্য একটী শ্রেষ্ঠকল্পের রত্ন। সাধারণ মানবের নিকট ঈদৃশ সিদ্ধান্ত মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে বটে, কিন্তু জ্ঞানীর নিকট তাহা নহে। সত্য যে একটী শ্রেষ্ঠ কল্পের রত্ন, তাহা মনীষিগণ সর্ব্বদাই জ্ঞাননয়নে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন; এবং এই হেতুই তাঁহারা পার্থিব রত্নে উপেক্ষা করিয়া সত্য লাভার্থ অহোরাত্র যত্নপর হয়েন।

সত্য কল্যাণ লাভের এক সুনিশ্চিত পন্থা। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে কোন প্রথা সমাজে প্রচলিত কর না কেন, তাহা নিশ্চয়ই কল্যাণপ্রদ হইবে। সত্যেতে জীবন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে মানব প্রকৃতি যে বিবিধ আভরণে অলঙ্কৃত হইয়া উঠে, হৃদয় যে লোকোত্তর ভাব সকলের বিলাসক্ষেত্র হয়, আত্মা যে মহানুভব ও উন্নতিশীল হয় এবং জীবন যে অমৃতময় হইয়া উঠে, সক্রিটিস্ লুথার থিয়োডোর পার্কার প্রভৃতির এবং প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের জীবন তাহার প্রমাণ। সুতরাং যাহা দ্বারা মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, এবং অশেষ শ্রেয়োলাভ হয়, সেই অমূল্য সত্যরত্ন লাভ করিবার নিমিত্ত, জনসমাজে প্রত্যেকেরই সচেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। বস্তুত সত্যের তুলনায় পৃথিবীতে অন্য আর কিইবা প্রার্থয়িতব্য আছে? মানুষ যে আপনাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠজীব বলিয়া গর্ব্ব করে, তাহার নিগূঢ় হেতু কি? না, সে সত্যরাজ্যের অধিকারী। মানুষ যে জগতের মধ্যে একমাত্র আপনাকে অমরত্ব লাভের অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে তাহার কারণ কি? কে তাহাকে অমরত্ব প্রদান করে? সত্য, একমাত্র সত্য। প্রভুত্ব লাভ করিয়া মানুষ অমর হয় না; "অচিরাংশুবিলাস চঞ্চলা" লক্ষ্মীর কৃপায়ও মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে না। কিন্তু একমাত্র সত্যের প্রভাবে মানুষ

জগতে চিরস্মরণীয় হইয়াথাকে। নেপোলিয়ান্ প্রভৃতি বীরগণের নাম মানব স্মৃতি হইতে কালস্রোতে নিশ্চয়ই ধৌত হইয়া যাইবে, কিন্তু যাবৎ নভোমণ্ডল, গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি কল্পকোটি স্থায়ী পদার্থে শোভমান থাকিবে, তাবৎ যাজ্ঞবল্ক, সক্রেটিস্ নিউটন প্রভৃতির নাম মানব স্মৃতিতে দেদীপ্যমান থাকিবেই থাকিবে। সুতরাং সত্যের তুলনায় পৃথিবীতে অন্য আর কি বা প্রার্থয়িতব্য আছে ?

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে কি উপায়ে সেই সত্য লাভ করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব ?

এস্থলে সত্য-লাভের উপায় নির্ণয়ে ব্যাপৃত হওয়ার পূর্ব্বে, সত্য স্বরূপতঃ কি তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা সঙ্গত। যেমন পদার্থ সমুদয়ের বিশ্লেষণ করিলে, কতকগুলি মৌলিক উপাদান পাওয়া যায়,তদ্রূপ এই বিশ্বজগতে অহরহঃ যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইতেছে,মনোযোগের সহিত দেখিলে প্রতীতি হইবে যে তাহারাও কতকগুলি মৌলিক নিয়মানুসারে নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে। এই সকল মৌলিক নিয়মই সত্য। কেবল জড় জগতই যে সত্যের কার্য্যক্ষেত্র তাহা নহে; জড়রাজ্য যদ্রূপ সত্য দ্বারা নিয়মিত আধ্যাত্মিক রাজ্য ও তদ্রূপ সত্য দ্বারা পরিচালিত। ভৌতিক ঘটনাবলীর মূলে যদ্রূপ কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম বিদ্যমান আছে, মানসিক ক্রিয়া সমূহের মূলেও তদ্রূপ কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম বিরাজমান আছে। জগতের যদ্রূপ সীমা নাই, জগতের অন্তর্নিহিত সত্য সকলের ও তদ্রূপ শেষ নাই। বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন অংশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্য আধিপত্য করিতেছে; এবং সেই সকল অবগত হইবার নিমিত্ত দর্শন জ্যোতিব পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের উদ্ভাবন হইয়াছে।

অতএব ইহা হইতেই প্রতীতি হইবে যে সত্যলাভের পন্থা এক নহে পরন্তু বহুবিধ ঃ—ভাষাগত সত্যের নির্ণয় করিতে হইলে যে প্রণালীর অনুসরণ করিতে হয় বাহ্য প্রকৃতির মূলানুসন্ধান করিতে হইলে তাহাতে চলিবে না ; তজ্জন্য স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক ; অঙ্কশাস্ত্রের অখণ্ডনীয় মূল নিয়মগুলি অবগত হওয়ার নিমিত্ত গবেষণাই মুখ্য উপায়, তজ্জন্য পর্য্যবেক্ষণের বড় বিশেষ প্রয়োজন নাই, কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব সকলের আবিষ্কার করিতে হইলে বহুদর্শন ঐকান্তিক ভাবে প্রয়োজনীয় ; পরন্তু নৈতিক নিয়ম সকল অবগত হইতে হইলে শুদ্ধ গবেষণাতেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইবে না, তজ্জন্য প্রজ্ঞার আশ্রয় গ্রহণ আবশ্যক।

কিন্তু সত্যোপলব্ধির পন্থা পৃথক্ পৃথক্ হইলেও তাহারা সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্র নহে। এমন কতকগুলি বিধি আছে যাহারা কি পদার্থবিদ্ কি দার্শনিক কি চিকিৎসাতত্ত্বানুসন্ধায়ী কি নীতিশাস্ত্রকার সকলেরই সমভাবে অবলম্বনীয়। ইহাদিগকে সত্যলাভের সাধারণ বিধি বলা যাইতে পারে। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লাভার্থ ইহাদিগের সাহায্য যদ্রূপ প্রয়োজনীয়, বাহ্য প্রকৃতির মূল অন্বেষণার্থ ইহারা তদ্রূপ প্রয়োজনীয়। সংক্ষেপতঃ, বিশেষ বিধি অবলম্বন কর আর নাই কর, সত্য লাভার্থ এই সকল সাধারণ বিধি অবলম্বন না করিলে চলিবে না। এই সকল অপরিহার্য্য বিধি অতিক্রম করিয়া কেহ কোন দিন সত্যলাভ করিতে পারে নাই, এবং পারিবেও না। দর্শনের নিমিত্ত যদ্রূপ আলোক আবশ্যক, সিদ্ধির নিমিত্ত যদ্রূপ

সাধনা আবশ্যক, সত্য উদ্ধারের নিমিত্ত তদ্রূপ এই সকল সাধারণ বিধির প্রয়োজন। আমরা নিম্নে কতিপয়ের উল্লেখ করিতেছি।

ইন্দ্রিয়গণকে জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ করা সত্য লাভের এক মুখ্য উপায়। যাহারা বিষয়বিমুগ্ধ বিলাসীর ন্যায় চক্ষু কর্ণ নাসিকাদির পরিতৃপ্তিকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য করিয়াছে এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিদিগের ন্যায় ভোগের উপাদান সংগ্রহেই সতত ব্যস্ত তাহাদিগের দ্বারা কি প্রকারে সত্যলাভ হইতে পারে? যাহারা নিরন্তর জগতের উপরিভাগে বুদ্বুদের ন্যায় ভাসমান রহে, তাহারা কি প্রকারে জগতের মূলীভূত, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত তত্ত্বসকলের সন্ধান পাইবে? সমুদ্রগর্ভনিহিত রত্ন আহরণার্থ যেমন অগাধ জলরাশি ভেদ করিয়া জলনিধির তলদেশে উপনীত হওয়া আবশ্যক, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রত্নরাজির সন্ধানার্থও তদ্রূপ ঘটনাবলীর বহিরাবরণ ভেদপূর্ব্বক তদীয় অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক। সুতরাং যাহারা ইন্দ্রিয়গণের পরিতৃপ্তিকে উপেক্ষা করিয়া জগতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা চক্ষুরুন্মীলিত রাখেন কেবল তাঁহারাই সত্যের সন্ধান পাইয়া জীবন কৃতার্থ করিতে পারেন। পুরাকালের জ্যোতিঃস্বরূপ জগদ্বিখ্যাত আর্কিমিডিস ভোগসুখ উপেক্ষা করিয়া নিরন্তর এইরূপ চক্ষুরুন্মীলিত রাখিতেন বলিয়াই আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের এক সহজ পন্থা আবিষ্কৃত করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। যদি তিনি ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিলাসীর ন্যায় সুখের উপাদান সংগ্রহেই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন, তাহা হইলে কি উল্লিখিত আবিষ্কার-জনিত গৌরব তাঁহার ভাগ্যে ঘটিত? তাহা নিশ্চয়ই অন্য কোন মহা পুরুষের নাম প্রাতঃস্মরণীয় করিত। জ্ঞানী নিউটন যদি ইন্দ্রিয়গণকে জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ না করিয়া তাহাদিগের পরিতৃপ্তিকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য করিতেন, তবে কি তিনি একটী আতা ফলের পতন দর্শন করিয়া মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে পারিতেন? কখনই নহে; বরং একটী আতাকে ভূপতিত হইতে দেখিয়া তদ্ভক্ষণার্থে লোলুপ হইতেন এবং কি উপায়ে তাহা অধিকতর সুখপ্রদ হইবে তাহা নির্দ্ধারণার্থই ব্যাকুল হইতেন। কিন্তু তিনি ইন্দ্রিয়গণকে জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ করিতে পারিয়া ছিলেন বলিয়াই, আতার পতন দর্শনরূপ দ্বারের মধ্যদিয়া প্রকৃতির প্রিয় নিকেতনের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন এবং তথা হইতে এক মহাসত্যের উদ্ধার করিয়া তদীয় জ্যোতিতে বহুপরিমাণে জগতের অন্ধকার অপসারিত করিয়া গিয়াছেন।

হৃদয়োৎকর্ষ সত্যলাভের দ্বিতীয় সহায়। সত্য লাভের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গণকে জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ করা যেমন প্রয়োজনীয়, তজ্জন্য হৃদয়ের উৎকর্ষও তেমন আবশ্যক। অনেকেই বলিবেন, সত্যোপলব্ধির জন্য আবার হৃদয়োৎকর্ষের প্রয়োজন কি? বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতাই তজ্জন্য যথেষ্ট। এইরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। যদি সদ্বিষয়ে অনুরাগ না থাকে, যদি সাধারণের ভ্রমান্ধকার ভেদ করিতে সাহস না হয়, যদি ভক্তি না থাকে, যদি শ্রদ্ধা না থাকে, যদি সর্ব্বসাধারণের প্রতি করুণার পরিধি বিস্তৃত না হয়, যদি সত্যের নির্ম্মল জ্যোতিতে হৃদয় আকৃষ্ট না হয়, তবে শুধু বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা থাকিলে কি হইবে? পরাবিষ্কৃত সত্য আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত শুধু

বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা থাকিলেই চলে বটে, তজ্জন্য ভক্তি সাহস কৌতূহলাদির অতিমানুষিক বিকাশের তত প্রয়োজন নাও হইতে পারে, কিন্তু নূতন সত্য লাভ করিতে হইলে হৃদয়ের উৎকর্ষ একান্ত আবশ্যক।

সত্যলাভ করা বড় কঠিন ব্যাপার। কাহারও পদার্থ নিচয়ের বহিরাবরণ ভেদপূর্ব্বক জগতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা থাকিলেই যে তাহা দ্বারা কোন বিষয়ের সত্যোদ্ধার হইবে এমত নিশ্চয় করা সমীচীন নহে। যদি সেই শক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার, সেই বিষয় সম্বন্ধে সাধারণের মনে যে সকল কুসংস্কার বদ্ধমূল আছে সেই সকল উৎপাটন করার সাহস না থাকে, তবে তাহা দ্বারা কদাপি সেই বিষয়ে কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে না। সত্যলাভের জন্য সৎসাহসের একান্ত আবশ্যক। লৌকিক প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিবার সাহস যাহাদের নাই মিথ্যা বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইলেও যাহারা লোকভয়ে সত্যাবিষ্কারের চেষ্টা হইতে বিরত থাকে, তাহাদিগের ধীশক্তি প্রখরা হইলেও উহা লোকভয়ে রাহুগ্রস্ত রবির ন্যায় ম্লান থাকে, উহা দ্বারা পৃথিবীর অন্ধকার দূরীভূত হয় না। প্রকৃতি কখনই তাদৃশ ভীরু কাপুরুষদিগকে সত্যরত্নের অধিকারী করেন না। জগদ্বিখ্যাত গ্যালিলিও যদি পৃথিবীর গতিসম্বন্ধে সাধারণের ধারণা ভ্রমাত্মক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াও লোকভয়ে ভীত থাকিতেন, তবে কি তিনি কোন নূতন সত্য লাভ করিতে পারিতেন? সাধারণে যে সত্যলাভে বঞ্চিত তাহার এক নিগূঢ় কারণ এই যে, সাধারণের লৌকিক প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার সাহস নাই। যদি সাধারণের চিরপ্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মস্তকোত্তোলন করার সাহস থাকিত তবে আবিষ্কৃত সত্যের সংখ্যা এত অল্প হইত না, সমাজে ঘোর মূর্খতার এত আধিপত্য হইত না।

ক্রমশঃ।

ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।)

১২। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ প্রণালী।

১৭৬৫ শক হইতে ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হইবার জন্য একটী প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিবার নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল। এই বৎসরের ৭ই পৌষ তারিখে শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তত্ত্ববোধিনী সভার আরও ১৯ জন সভ্য তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। * * চন্দ্রশেখর দেব এবং ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের স্বর্গীয় পিতা নন্দকিশোর বসু রামমোহন রায়ের আদিম শিষ্য ছিলেন। ইঁহারা সেই প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করেন। (১) এই সম্বন্ধে শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন "প্রথম যখন ১৭৬৩ শকে ব্রাহ্মসমাজ দেখি, তখন তাহাতে পাঁচ জন কি ছয় জন উপবেশন করিতেন; দেখিতাম যে শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় তাহার মধ্যে প্রতিবারেই আছেন। আর পশ্চিম দিকে খানকতক চৌকি পাতা থাকিত, তাহাতে আগন্তুক পথিকেরা আসিয়া বসিত। তখন আমারদের এই চিন্তা হইল, সমাজে অধিক লোক কি প্রকারে হইবে? ক্রমে ঈশ্বরপ্রসাদে লোক বাড়িতে লাগিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘরও

১ দাসী, ৪র্থ ভাগ, ১১ সংখ্যা।

বাড়িতে লাগিল। ইহাতেই আমাদের কত উৎসাহ। প্রথমে ইহা দুই তিন কুটরিতে বিভক্ত ছিল, ক্রমে সেই সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া এই গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে। যতই ঘর প্রশস্ত হইতে লাগিল, ততই লোকের কোলাহল দেখিয়া মনে করিতাম যে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি হইতেছে। যখন দেখি এই ঘরেতে নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়, তার পরে তেতালা নির্ম্মিত হইল। যখন লোক বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন মনে হইল যে লোক বাছা আবশ্যক। কেহ বা যথার্থ উপাসনা করিতে আগমন করে, কেহ বা লক্ষ্যশূন্য হইয়া আইসে—কাহাকে আমরা আমারদের বলিয়া বলিতে পারি? এই আন্দোলন হইয়া স্থির হইল—যাঁহারা প্রতিজ্ঞাগ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন। যখন ব্রাহ্মসমাজ আছে, তখন তাহার প্রতি সভ্যের ব্রাহ্ম হওয়া চাই। যাঁহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রতী হইয়া প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষর করিবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন—এই মনে করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিজ্ঞা রচনা পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আচার্য্যের নিকট ১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষে আমরা প্রথম এক দল ব্রাহ্ম হইলাম। অনেকে হঠাৎ মনে করিতে পারেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মসমাজ নাম হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে ব্রাহ্মনাম স্থির হয়। যখন প্রতিজ্ঞা দ্বারা ব্রাহ্ম হওয়া স্থির হইল, তখন এই মনে ছিল যে যাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্ম হইবেন, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন, যত্নশীল হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মপালন করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই হইল যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াও তাহা পালন করিতে অনেকে ঔদাস্য করিতেন ও গর্হণীয় হইতেন।" * তাহার পরে ১৭৬৬ শকে ভক্তিভাজন বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রচারক লালা হাজারীলাল কর্ত্তৃক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন।

প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করা একটা বহিশ্চিহ্নমাত্র; অন্তরে প্রতিজ্ঞার বল না থাকিলে এই বহিশ্চিহ্ন কোনই কার্য্যকর হয় না; তবে অন্তরে প্রতিজ্ঞা রক্ষার বিশেষ চেষ্টা থাকিলে এই বহিশ্চিহ্ন অনেক সহায়তা করে। এই কারণেই উপনয়ন ও তৎসঙ্গে দিবা কালে নিদ্রা যাইব না ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ এবং এই কারণেই বিবাহ কালে অব্যভিচারী হইব ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা আছে।

প্রথম প্রথম যে প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে প্রথম প্রতিজ্ঞা ছিল "আমি বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম"। চতুর্থ প্রতিজ্ঞায় লিখিত ছিল * * "প্রতিদিবস সূর্য্যোদয়ের পরে মধ্যাহ্নকালের মধ্যে ন্যূনসংখ্যা দশবার প্রণব ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী জপ করিব।" অনেকে আবার নূতন উৎসাহের বশবর্ত্তী হইয়া মুদ্রিত প্রতিজ্ঞা পত্রের গায়ে নিজ নিজ মনোমত অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞা হস্তাক্ষরে লিখিয়া রাখিতেন। সেই সকল প্রতিজ্ঞার দুএকটী দেখিয়া এখনকার লোকে উপহাস করিতে পারেন; কিন্তু তখন তাঁহারা যথার্থ ভক্তিভাবে তাহা গ্রহণ করিতেন। তদানীন্তন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার প্রতিজ্ঞাপত্র নিম্নোক্ত প্রতিজ্ঞার সঙ্গে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন "কোন দিবস নিয়মিত সময় মধ্যে কোন ব্যাঘাত প্রযুক্ত যদি দশবার

* পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত।

জপ না করিতে পারি, তবে তদ্দিবসে অন্য সময়ে কিম্বা তৎপরদিবসে চিত্ত একাগ্র হইলে জপ যে বক্রী থাকিবেক তাহা সম্পূর্ণ করিব। কিন্তু এই কর্ম্মপ্রবণ নিষ্ঠাহীন শতাব্দীতে অনেকেই সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়াতে উক্ত প্রতিজ্ঞার পরিবর্ত্তে আর একটু সাধারণভাবে প্রতিদিন ঈশ্বরের উপাসনা করিবার ব্যবস্থা হইল। পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞাপত্রের মধ্যে আর একটী প্রতিজ্ঞা ছিল "কোন ব্রাহ্ম বিপদগ্রস্ত হইলে যথাসাধ্য তাঁহাকে সাহায্য করিব।" তাহার গায়ে পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন "এবং ব্রাহ্ম ভিন্ন অন্য ব্যক্তিদিগেরও যথাসাধ্য উপকার করিব।" এই প্রতিজ্ঞা হইতে তখনকার একটা ভ্রাতৃভাব, একটা উদার প্রীতি বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। পূর্ব্বকার প্রতিজ্ঞাপত্রের আরও একটী প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ করিব; তাহা এই—"আমার বংশে এই সনাতন ধর্ম্মের উপদেশ করিব।" এই দুই প্রতিজ্ঞাটী আমার বোধ হয়, বর্ত্তমান প্রতিজ্ঞাপত্রেরও অন্তর্গত করা উচিত। যদিও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনের কথা বলাতেই শেষোক্ত প্রতিজ্ঞার দুইটী বিষয়ও স্বভাবতই আসিতেছে, তথাপি প্রথমাবস্থার লোকেরা এই দুইটি পৃথক্ ভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিয়াছিল। আর, আমরাও মনে করি যে অন্ততঃ সর্ব্বশেষ প্রতিজ্ঞাটী বর্ত্তমান প্রতিজ্ঞাপত্রে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমানে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ করিবার প্রতিজ্ঞা কয়টী ও প্রণালী এইরূপ—

আমি ব্রাহ্মধর্ম্মবীজে বিশ্বাসপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছি।

১। ওঁ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলদাতা, সর্ব্বব্যাপী, মঙ্গলস্বরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র, অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি দ্বারা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব।

২। পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না।

৩। রোগ বা কোন বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।

৪। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল থাকিব।

৫। পাপ কর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইব।

৬। যদি মোহবশতঃ কখন কোন পাপাচরণ করি, তবে তন্নিমিত্তে অকৃত্রিম অনুশোচনা পূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত হইব।

৭। ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধনার্থে বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মসমাজে দান করিব।

হে পরমাত্মন্! সম্যকরূপে এই পরমধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা আমার প্রতি অর্পণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

জাপানে কন্যা বিক্রয়।

আজকাল জাপানের সংবাদ বড় মন্দ। তথায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে; সহস্র সহস্র নরনারী বালক বালিকা প্রতিদিন কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। জাপান গবর্ণমেন্ট এই দেখিয়া কথঞ্চিৎ কষ্ট নিবারণের নিমিত্ত এক কঠোর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাহা—কন্যা বিক্রয়। কন্যা বিক্রয় দ্বারা পিতা মাতার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিতে উক্ত গা-

রাজ্যে আদেশ দিয়াছেন। যে দেশে পিতা মাতার প্রতি ভক্তি সন্তানের অবশ্য পালনীয়; যে দেশের শাসন প্রণালীতে তাহার বিরুদ্ধাচরণ কঠিন দণ্ডার্হ বলিয়া বিধিবদ্ধ আছে, তথায় কন্যা বিক্রয় কিছু নিষ্ঠুরতা বা সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কোনও সমাজকে নিন্দা ও ঘৃণা করিবার পূর্ব্বে, আমাদিগের অগ্রে তাহার রীতি নীতি যথা সাধ্য পর্য্যালোচনা করা উচিত, একবারে তাহার প্রতি দোষারোপ করা আদৌ বিধেয় নহে। আমরা জাপান সাম্রাজ্যের সমস্ত সমাজ-নীতি অবগত নহি; স্বচক্ষে সেই সুন্দর উন্নতিশীল দেশ দেখি নাই, স্বকর্ণে উহার দোষাদোষের বিষয় শ্রবণ করি নাই; তবে কিম্বদন্তী ও ইংরাজী লিখিত বিবরণ পাঠের উপর নির্ভর করিয়া যাহা কিছু জানা যায়, তাহা লইয়া বিচার করিতেছি। পাঠক যেন মনে না করেন যে,আমরা সাধারণত কন্যাবিক্রয় প্রথাকে ভাল বলিয়া অনুমোদন করিতেছি; কিন্তু যে প্রকারে জাপানে কন্যা বিক্রীত হয়, তাহাতে তত দোষ দেখিতে পাই না; প্রত্যুত,ইহাতে জাপান সাম্রাজ্যের হীনতম প্রজার প্রতিও যে রাজার দৃষ্টি আছে তাহা উত্তমরূপে জানিতে পারা যায়। দীনহীন পিতা বা মাতা একটি কন্যা বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে কথার স্থিরতা হইতে লাগিল। মূল্য নির্দ্ধারিত হইল। জাপানে বিক্রেয় কন্যার মূল্য প্রায় এক পাউণ্ড হইতে দশ-পাউণ্ড। কিন্তু আজ কাল দুর্ভিক্ষের সময় এক পাউণ্ড মূল্যে প্রায় বিক্রয় হইতেছে। সমস্ত কথা নির্দ্ধারিত হইলে গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারীর নিকট গমন করিয়া বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের মধ্যে যে যে সর্ত্ত হইল, তৎসমুদয় ও কন্যাকে ক্রেতার বাটীতে যাহা যাহা করিতে হইবে সে সমস্ত এক রেজিষ্টরে লিখাইতে হয়। পরে মূল্য দিয়া ক্রেতা উহাকে আপনার বাটীতে লইয়া যান। বিক্রয় কার্য্য এইরূপে সম্পন্ন হইল। সম্রাট-প্রতিনিধি-সমক্ষে লিখিত ও রেজেষ্টরী ভুক্ত সমস্ত সর্ত্ত সম্মান পূর্ব্বক উভয় পক্ষকে বিশেষতঃ ক্রেতাকে চলিতে হয়। কোনও প্রকারে সর্ত্তের অবমাননা করিলে অপরাধী পক্ষীয়দিগের দণ্ড হয়। তথাকার ধনবান ব্যক্তিগণ সকলে না হউক কেহ কেহ যেমন অপরাপর দেশে বড় মানুষের ঘরে মহামূল্য দ্রব্যজাত থাকে, সেইরূপ এবম্বিধ এক এক কন্যা ক্রয় করিয়া সংসারের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

তিন বৎসরকাল অতীত হইলে ক্রীতা কন্যা আপনার পিতামাতার নিকট পুনরায় গমন করিতে পারে। কিন্তু একটু কথা আছে। যে টাকায় কেনা,সে টাকা আদায় করিবার যদি কিছু বাকি থাকে,তাহা হইলে তিন বৎসর পরে উহার পিতা মাতার নিকট প্রত্যাগমনের স্বাধীনতা ও অধিকার হইতে সুদূরে অবস্থিতি করিতে হয়; কিন্তু ছয় বৎসর পরে ঋণ পরিশোধ হউক বা না হউক উহার প্রত্যাগমন করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার আছে। ইহাকেই বলে জাপানে কন্যা বিক্রয়। এই প্রথাবলম্বনে তথায় এক্ষণে কন্যা বিক্রীত হইতেছে।

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

ভারতে স্বাধীন আর্য্য-মিশন।

ওঁ তৎসদিতিনির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥ ১৭।২৩
গীতা।

ওঁ, তৎ, সৎ, ব্রহ্মের এই তিনটী নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সৃষ্টির প্রারম্ভে সেই ব্রহ্ম কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ, বেদ, ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছে।

১। যাহা সত্য নিত্য ও সর্ব্ব জীবের হিতকর তাহাই আর্য্যধর্ম্ম।

২। আর্য্যধর্ম্ম-বীজ বেদেই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

৩। বেদ-সনাতন ধর্ম্ম ও জ্ঞানের আধার; সৃষ্টির প্রথমে সেই সনাতন ধর্ম্ম ও জ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়া জীবজগতের মঙ্গল বিধান করিয়া আসিতেছে।

৪। মঙ্গলাকর মহেশ্বর সুশৃঙ্খলে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করাইবার জন্য জ্ঞানও কর্ম্ম অনুসারে মনুষ্যে বর্ণ বিচার করিয়া দেন।

(ক) বেদের সমসাময়িক বলিয়া ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বর্ণে অভিহিত হইয়া থাকেন।

(খ) ক্ষত্রিয় তাঁহার অনুগমন করিয়া সংসারে শান্তি রক্ষা করেন।

(গ) বৈশ্য তাঁহাদেরই বশবর্ত্তী থাকিয়া কৃষি কার্য্য, ব্যবসায় এবং বাণিজ্যের ভার গ্রহণ করিয়া সংসারকে পোষণ করেন।

(ঘ) আর শূদ্র সকল বর্ণের সেবা করিয়া থাকেন।

যদি মনুষ্য এই চারিভাগে বিভক্ত থাকিয়া সংসার ধর্ম্ম রক্ষা করে তাহা হইলে কখন কোন কালে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

"প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন" যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সমাজ রক্ষা হয় না। সকলকে প্রয়োজনীয় সকল কার্য্য সমাধা করিয়া লইতে হইলে সংসারে বিশৃঙ্খলা ঘটে। সেই বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করিবার জন্য একজন অন্যের উপর নির্ভর করিবে। তাই সৃষ্টির প্রথমে সমাজ সংস্থাপনের নিমিত্ত বর্ণ বিভাগের প্রয়োজন হইয়াছিল। বর্ণ বিভাগ মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। এখন বর্ণ ব্যভিচার হইয়াছে বলিয়া সংসারে এত কষ্ট। এবং সে কষ্ট নিবারণের জন্য উপায় বিধান করা আর্য্য ধর্ম্মের সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য।

এখন কথা হইতেছে কর্ম্মশীল ধর্ম্মপরায়ণ নিম্নস্তরের লোক স্ব স্ব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইহলোকে উর্দ্ধতন বর্ণাশ্রমে উত্থিত হইতে পারিবে কি না? অর্থাৎ যোগ্যতানুসারে "শূদ্র" বৈশ্য হইতে "বৈশ্য" ক্ষত্রিয় হইতে, এবং "ক্ষত্রিয়" ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে কি না?

যদি সংস্কার লইয়া কথা হয়, তাহা হইলে সহসা তাহা হইতে পারে না। তাহার প্রবৃত্তি স্রোত যে শোণিত শুক্র অবলম্বন করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার মূলে জাতিগত পার্থক্যের বীজ অঙ্কুরিত। সে অঙ্কুর সময়ের সদ্ব্যবহারে অবস্থার সুঘটনায় এবং দেশের জল বায়ুর গুণে অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিত ও উন্নত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার ব্যতিক্রমে অর্থাৎ ঘটনাচক্র ফিরিয়া আসিলে তাহাকে পূর্ব্বাবস্থায় উপনীত হইতেই হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একথার উল্লেখ এইরূপে করা যাইতে পারে। বিবেচনা করিয়া দেখ, ঘটনাচক্রে পড়িয়া কতকগুলি অবস্থা শূদ্রের অনুকূল হওয়ায় সে বিদ্বান ধনবান যশস্বী হইয়া উঠিল; তাহা বলিয়া সে উর্দ্ধতন বর্ণত্রয়ের কোন কোন বিষয়ে সমান হইলেও তাহার স্ববর্ণে তাহাকে পরিচালিত হইয়া থাকিতেই হইবে। বৈবাহিক ক্রিয়া কলাপ তাহার পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে সম্পাদিত হইবে। সে যত কেন উন্নত হউক না, তাহার সমাজ তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিবেই ধরিবে। সুতরাং সে নিজের সমাজকে সমানভাবে উন্নত করিতে না পারিলে এক পদও অগ্রসর হইয়া উর্দ্ধতন অন্য বর্ণের সহিত মিলিত হইতে কখনই পারিবে না! আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কারণে তাহার উন্নতি হইয়া ছিল তাহার অধঃপতন হইলে পর অচিরাৎ তাহাকে বা তাহার বংশধরদিগকে সেই কারণ বশতঃই সেই নিম্নস্তরে নিমজ্জিত হইতে হয়।

ব্রাহ্মণ মূর্খ হইয়াও সে ব্রাহ্মণ কুলের যেমন অন্তর্গত হইবে সেইরূপ ক্ষত্রিয় রাজপদ বা সেনাপতি পদ হইতে চ্যুত হইলেও সে সিপাইরূপে রাজ্য রক্ষা করিবে। বৈশ্য ধনোপার্জ্জনে অক্ষম হইলে বৈশ্যের বিপণীতে সহকারী থাকিয়া শুভ সুযোগের প্রতীক্ষা করিবে। শূদ্রে তাহা সম্ভবে কৈ?

এখানে খৃষ্ট সমাজ বা মুসলমান সমাজের দৃষ্টান্ত দিলে চলিবে না। কারণ তাহাদের সমাজ গঠন অন্যরূপ; আমরা সেরূপে সংক্রামিত হইয়া অনার্য্য ভাবে নূতন সমাজ সংগঠন করিতে বা তাহাদের দলে মিশিতে পারিতেছি না। আমরা যাহা তাহাই থাকিতে চাহিতেছি। তবে তাহার যেখানে যেরূপ ব্যভিচার আরম্ভ হইয়াছে তাহার প্রতিকার করিতে আমাদের বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। অনেকে পুনর্জন্ম মানিতে চাহেন

না কিন্তু ক্রমবিকাশসূত্র ধরিয়া সমাজের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে পুনর্জন্ম মানিতেই হইবে। সৃষ্টির আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যে ভাগ্য (কর্ম্ম) চক্র ঘুরিতেছে তাহার ঘুরা ধরিয়া কে সে গতির হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারে? অদৃষ্ট (unforeseen circumstance) তাহাকে যতক্ষণ সুপরিস্পর্শ করিতে না পারিবে ততক্ষণ তাহার আবর্ত্তন (evolution) ক্রিযার প্রয়োজন হইবেই হইবে। সেই আবর্ত্তন কালে কত অভাবনীয় পরিবর্ত্তন আনিয়া ফেলে তাহাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হওয়া জীবের সাধ্য নহে। তাই হিন্দু অদৃষ্ট-কর্ম্মবাদী; এই কর্ম্মা-মুস্যূত অদৃষ্ট শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া সংসারে হরিশর্ম্মা ব্রাহ্মণ দ্বারকা বর্ম্মণ ক্ষত্রিয় মুরারি বৈশ্য এবং ভারতী দাস শূদ্র হইয়াছে।

এ প্রথার দোষারোপ করিয়া অনেকে অনেকপ্রকার সমাজ সংস্কার করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু কি করিতে পারিলেন? দৃষ্টান্ত স্বরূপ পঞ্জাবের "নানক" এবং বাঙ্গালার "চৈতন্যের" নামোল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

ক্ষত্রিয়পুত্র নানক জাতিবিচার উঠাইয়া দিয়াছিলেন। কত ব্রাহ্মণ কত ক্ষত্রিয়, কত বৈশ্য নানক-প্রচারিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়া "জাঠ" জাতির অন্তর্ভূত হন। পশ্চাৎ দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা আবার তাহাতে বিরক্তি প্রদর্শন করিয়া ভাসিয়া উঠিয়া আপনাপন কুলাচার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে! যাহারা "বর্ণ ধর্ম্মের" সমস্ত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া বিমিশ্র জাতিদিগের ন্যায় নিম্নগামী হইয়াছিল, তাহারা আজি "জাঠ" বলিয়া পঞ্জাবে পরিচিত! পঞ্জাবে কাহাকেও "জাঠ" বলিলে গালাগালি দেওয়া হয়। সেই জাঠেরাও এখন অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইয়া কেহ শূদ্র কেহ বৈশ্য হইয়া হিন্দু দলের পুষ্টি সাধন করিতেছে। যে শিখেরা এক সময় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ মুসলমানদিগকে সঙ্গে করিয়া লইবার জন্য জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহার পর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারাই হিন্দু হইবার জন্য লালায়িত। গুরুগোবিন্দ সিংহ অম্বিকা দেবীর চরণে মস্তক অবনত করিয়া যে প্রায়শ্চিত্তের সমাবেশ করেন তৎপশ্চাৎ পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ নিজ জয়পতাকার সঙ্গে "অকালপুরুষের" নাম অঙ্কিত করিয়া হিন্দুসমাজ পুনঃস্থাপন করেন। তাহার পরেই দেখিতে পাওয়া যায় শিখসমাজ হিন্দুসমাজের অন্তর্গত। বাঙ্গালার বর্ণাশ্রম-ধ্বংসকারী চৈতন্য "যবন হরিদাস"কে সঙ্গে লইয়া যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁহার সেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের এখন কি দুর্দ্দশা? চৈতন্য-শিষ্য নেড়া নেড়ীর দল বলিলে কি বুঝায়? বুদ্ধিমান পাঠক তাহা স্মরণ করিয়া দেখুন। মুসলমানদিগের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে "রূপ সনাতন" অন্তর্হিত হইলেন। কালে বৈষ্ণব ধর্ম্ম হিন্দুদিগের সহিত মিলিত হইয়া আবার ব্রাহ্মণগণের শরণাগত হইয়াছে।

তাই আমরা ভারতে "ভারতের ধর্ম্ম" প্রচার দেখিতে চাই! যে রীতি অবলম্বন করিয়া ভারতে কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল, তাহা আবার প্রবর্ত্তন করিতে চাই। তাহার ভিত্তিতে জাতিগত পার্থক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা ঘৃণার দৃষ্টিতে নহে প্রেমের দৃষ্টিতে। তাই বলিতে ছিলাম, ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ আমাদের শিরোভূষণ হইবেন। প্রয়োজনীয় বল বীর্য্যের পরিখা খনন করিয়া ক্ষত্রিয়দুর্গে আমরা সুরক্ষিত হইব। জীবনোপায় সাধনের নিমিত্ত বৈশ্য আমাদের ধনভাণ্ডার রক্ষা করিবেন। আর ছায়ার ন্যায় কায়াবিশিষ্ট শূদ্রেরা আমাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবেন। এইরূপে একাঙ্গ হইয়া আবার আমরা সমাজ সঙ্গঠন করিব। তাহা হইলে বুঝিতে পারিব আমাদের দেশের দুর্দ্দিন বিদূরিত হইয়াছে।

কি উপায়ে সে কার্য্য সংসাধিত হইবে আর্য্যসমাজ তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবেন। আর্য্যসমাজের অধিনেতা ব্রাহ্মণ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। তিনি সকল বর্ণের সত্ত্বা রক্ষা করিয়া আর্য্যসমাজ পুনঃ প্রবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত যত্ন পাইয়া বেদরূপ মহাদ্রুমের তলায় উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেই বেদের চারি শাখা অসংখ্য পত্র, অসীম বিস্তৃতি, পরমাণুর ন্যায় তাহার অনন্ত বীজ চতুর্দ্দিকে অনন্তাধারে বিক্ষিপ্ত হইয়া সংসার-রূপ ক্ষেত্রকে ফলপুষ্পে শোভিত করিয়া রহিয়াছে। মহান আত্মা মহেশ্বর ইহার প্রাণ,জীব তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া সত্যের জ্যোতিতে পরিপুষ্ট হইয়া আবার তাঁহার নিত্যনিকেতনে গমন করিতে ধাবিত হইতেছে। পথের শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া (কর্ম্মচক্রের গাঁট খুলিয়া) যেরূপে সে ধাবিত হইতেছে, তাহার গতিরোধ করে কাহার সাধ্য? উপধর্ম্ম সকল উপলখণ্ডের ন্যায় ইতস্তত পতিত থাকিবে। মহাপ্রাণী মহাপ্রাণের পথে অগ্রসর হইতে অনন্তকাল অবসর লইবে। ইহারি মধ্যে কত জগৎ ধ্বংস হইবে, কত সূর্য্য নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে, কত গ্রহ, উপগ্রহ চন্দ্র তারকাবলী তাহার সঙ্ঘর্ষণে চূর্ণ হইয়া যাইবে, তখন এ প্রকার জাতিবিপ্লবের কি কথা? এ প্রকার বিপদ আপদের কি আশঙ্কা? এ প্রকার ক্ষণিক পরিবর্ত্তনে কি আসিয়া যায়? আইস, সকলে আমরা সমবেত হই, একতানে একপ্রাণে সেই প্রাণেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করি, তাহা হইলে আর হতাশ্বাস হইতে হইবে না।

উপস্থিত ঘটনার আর একটী কথা উত্থাপন করিলে আমার কথার সত্যতা আরও পরিষ্কৃত হইবে।

যৎকালে "ব্রাহ্মসমাজ" সংস্থাপিত হয়, তখন ব্রাহ্মণ রামমোহন রায়, হিন্দু সমাজ সংস্কারের জন্য কত যত্ন পাইয়াছিলেন। প্রথমে দেশের কএক জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সংগ্রহ করিয়া শাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করিলেন। যখন বেদ পাঠ হইত, তখন ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর জাতি সেখানে উপবিষ্ট হইতে পারিত না। ৺রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যেখানে বেদপাঠ করিতেন, সেখানে বনাতের কানাৎ টাঙ্গান হইত। শূদ্রেরা তাহার বাহিরে বসিতে পারিত। তখনকার সমাজের ধর্ম্মজ্ঞান,রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, ব্রাহ্মণেরা ব্যবস্থার অধিকারী ছিলেন। "ব্রাহ্ম সভায়" উপনিষৎ পাঠ শ্রবণ করিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। জানিতে পারিলেন, "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেমঃ," সে দেবতা কে, যাঁহাকে হবিঃ প্রদান করিতে হইবে? তাহার উত্তরে এক ব্রহ্মবাদী ঋষি কহিলেন

"যো দেবোঽগ্নৌ,যোঽপ্সু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ, য ওষধিষু, যো বনস্পাতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ"—

যিনি অগ্নিতে, যিনি জলেতে যিনি বিশ্ব সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, যিনি ওষধিতে এবং যিনি বনস্পতিতে বিরাজিত সেই দেবতাকে নমস্কার। কিন্তু তিনি এ অগ্নি নহেন, এ জলও নহেন, তিনি এ বিশ্ব সংসারও নহেন, এ ওষধি বনস্পতিও নহেন, তিনি ইহাদিগের "প্রাণস্য প্রাণম্"।

নচ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥
৫।৯॥ গীতা।

ভূত সমূহ আমাতে অবস্থান করে না, যদি চ আমি ভূত সমূহকে ধারণ ও পালন করিতেছি তথাপি তাহাতে আমার আত্মা সম্পূর্ণরূপে সংলিপ্ত নহে, এই অঘটন ঘটাইবার আমার ঐশ্বরিক (অসাধারণ) চাতুর্য্য অবলোকন করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। এই কথায় লোকের শাস্ত্রপাঠে শ্রদ্ধা জন্মিল; পূর্ব্বে যাহা তুলটে বা তালপত্রে লিখিত হইয়া টোলের চালিতে কীটদষ্ট হইতে টাঙ্গান থাকিত, এখন তাহা মুদ্রাযন্ত্রের সহায়ে সকল গৃহস্থের দ্বারে স্বল্প মূল্যে বিক্রীত হইবার নিমিত্ত উপস্থিত। এই জন্য সে সময়ে "ব্রাহ্ম সভা" বেদ, শ্রুতি, গায়ত্রী প্রকাশ করিয়া হিন্দু সমাজে "অহিন্দু" বলিয়া নিন্দিত ও তিরস্কৃত হইয়াছিল। এখন হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেরা সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়া লাভবান্ হইতেছেন। তাই গৃহস্থের পুরোহিতেরা এখন সন্ধ্যা, তর্পণ, ব্রতমালা, এবং চণ্ডী পর্য্যন্ত কণ্ঠস্থ করিয়া যাজন কার্য্য সহজ করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু তখনকার পণ্ডিতদিগের অনেকের শাস্ত্রজ্ঞান বা ভাষাজ্ঞান তাদৃশ ছিল না! তাই ভাষান্তরিত শাস্ত্র বিকৃত হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল। খৃষ্টান পাদরিরা তাহার উপর নির্ভর করিয়া হিন্দু ধর্ম্মকে বিকলাঙ্গ করিয়া জন সাধারণের সম্মুখে ধরিতে লাগিলেন। (তাঁহাদের শিষ্যেরা) ইংরাজী শিক্ষিত নব্য দল তাহা দেখিয়া স্বধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। এই বীতশ্রদ্ধ হিন্দু সন্তানগণ "ব্রহ্মসভায়" আসিয়া ব্রহ্মসভার পবিত্রতা অপহরণ করিয়া বাইবেলোক্ত ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া "ব্রহ্মসভাকে" "ব্রাহ্মসমাজ" নাম দিয়া বিজাতীয় ভাবাপন্ন করিয়া তুলিলেন। এই সময়ে "ব্রহ্মসভার" পতনভাব সম্মুখীন হইয়া উঠিল। ইহার পূর্ব্বেই রামমোহন রায় বিলাত গমন করিয়া দেহ ত্যাগ করেন। তৎপরে ব্রাহ্মণকুমার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎপদে অভিষিক্ত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপন করতঃ শাস্ত্রোদ্ধার করিতে যত্ন পান। তাঁহার সহচরদিগের মধ্যে অনেকে শূদ্র ছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ জাতির গৌরব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত উপায়ান্তর অবলম্বন করিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞানের সহিত আমাদের আত্মতত্ত্বের বৈষম্য দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গঠন বিভিন্ন প্রকার করিতে চাহিলেন। তখন আর্য্যকুলতিলক দেবেন্দ্রনাথ তাহাতে ভীত হইয়া তাঁহাদের পথে বাধা দিলেন। কিন্তু যাঁহারা খৃষ্টের অগ্নিময় মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাঁহারা সে বাধা শুনিবেন কেন? অচিরাৎ সে বাধা অতিক্রম করিয়া "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" নাম দিয়া আর এক অভিনব সমাজ সংস্থাপিত করিলেন। স্বাধীনতার যথেচ্ছ ব্যবহার সেখানে প্রশ্রয় পাইয়া তাঁহাদের বলবিক্রম দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। সুতরাং হিন্দু সমাজের উন্নতির স্রোত এখানে হ্রাস হইয়া গেল।

কিন্তু কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! সত্যের কি মহৎ বল! দুই দিন না যাইতেই এই ক্ষুদ্র দল বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, যাঁহারা এতকাল প্রচারক বলিয়া পূজা গ্রহণ করিতেছিলেন, তাঁহারা সমাজের অধিনায়ক হইতে চাহিলেন। নিরীহ মেষের ন্যায় কতকগুলি লোক তাঁহাদের অনুগমন করিয়া তাঁহাদিগকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন; আর যাঁহারা স্বাধীনতার মঞ্চে উপনীত হইয়াছেন বলিয়া অভিমান করিতেন, তাঁহারা তাহার প্রতিপক্ষতাচরণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই সময়ের ধর্ম্মতত্ত্ব নামক মাসিক পত্র পাঠ

করিলে আমি কোন্ কথার উল্লেখ করিতেছি পাঠকবর্গ সহজে তাহা বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা জাতি, বর্ণ, উচ্ছেদ করতঃ নূতন সম্প্রদায় সঙ্গঠন করিতে প্রয়াস পাইয়া বিবাহের বিল বিধিবদ্ধ করাইয়াছিলেন, বিবাহের বয়স নির্দ্ধারিত করিয়া ছিলেন, তাহার পর তাঁহাদের অধিনেতার প্রলোভন বিপদ উপস্থিত হইল; পরিশেষে তিনি নিজের সমাজের নিয়ম নিজে উল্লঙ্ঘন করিয়া এক মহারাজার ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। এই ক্ষুদ্র দলের ঘরোয়া বিবাদ এই স্থলেই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এদিকে আবার বিপদ দেখ! কন্যা রাজমহিষী হইবেন এই ভাবিয়া গৃহে যেমন আনন্দের লহরী উঠিতে লাগিল, অন্য দিকে তেমনি হিন্দুরাজপুরীতে জাতিচ্যুত ব্রাহ্মের কন্যা কিরূপে বিবাহিত হইবে তাই ভাবিয়া হুলস্থূল পড়িয়া গেল। শেষে সরকার বাহাদুর মীমাংসা করিয়া দিলেন, উভয়েরই ধর্ম্মনিয়ম রক্ষা হইবে, তবে উদীচ্য কর্ম্ম না হইলে মহারাণীর গর্ভজাত সন্তান রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারিবে না বলিয়া তাহার প্রতিকারার্থ হিন্দু ধর্ম্ম মতে শান্তি স্বস্ত্যয়ন সকলই সম্পাদিত হইবে। কেবল সেবক দলকে বুঝাইবার নিমিত্ত বাহিরে ব্রাহ্মসমাজের নিয়মমত ব্রহ্মোপাসনা হইবে। এই খানেই প্রধুমিত অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; স্বাধীনতাপ্রিয় সভ্যদল "কপটতা", "পৌত্তলিকতা" "প্রলোভন প্রিয়তা" ইত্যাদি বহুতর বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া অধিনায়কের দর্প খর্ব্ব করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে, ছেলে হইলে রাজপুত্র হইবে কি না তাহাই বা কোন্ কথা? সুতরাং অধিনেতার মত ফিরিল, হিন্দুধর্ম্ম পোষণের নিমিত্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞবিধির ব্যবস্থা হইল। তাহার নামকরণ হইল "নববিধান"। এই বিধানবাদীরা এখন হইতে স্বতন্ত্র হইয়া গেলেন, বেদী হইতে বিরুদ্ধবাদীদিগকে গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহারা তাহার ভয়ে পলাইতে পথ পাইলেন না। কিন্তু পলাইয়া যাইবেন কোথায়? হিন্দু সমাজ ছাড়িয়া আদি সমাজকে পরিত্যজ্য ভাবিয়া আর কোথায় যাইবেন? সুতরাং আর এক অভিনব সমাজ "সাধারণ সমাজ" নাম দিয়া সঙ্গঠন করিলেন। তাহার প্রভাব দেখে কে? চতুর্দ্দিক হইতে সাধারণীরা পতিতা, পতিত, বিচারে অক্ষম, পেটের দায়ে হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান, বিলাতফেরা যুবকের দল সঙ্গে করিতে লাগিলেন, বালাসুরে তুরী ভেরী বাজাইলেন, তাহা দেখিয়া বাজারের লোক জড় হইল, "আদি সমাজ" "নববিধান সমাজ" অন্ধকারে পড়িয়া রহিল, অনুষ্ঠানের খিচুড়ী অন্ন প্রস্তুত হইল, চৈতন্যের দল যে নেড়া নেড়ীর দল ছাড়িয়া পলাইয়াছিলেন, আবার ৩৫০ বৎসরের পর সেইরূপে সেই মতে লোকে মাতিয়া উঠিল। এখন ইহাদের বাহার দেখে কে? পাঠক এখন কি বুঝিতে পারিতেছ, ইহাদের দশা কি হইবে? তোমরা বুঝিতে পার আর না পার প্রধান গোঁসাই মহাশয় তাহা বুঝিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। অনেক দিনের পর তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনের বনে দেখা পাইলাম। ইনি এখন হরিনামে উন্মত্ত, গলায় মালার ছড়াছড়ি, নাকে কাণে তিলকাভরণ শোভিত হইতেছে, বৈষ্ণব শিষ্যেরা চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়াছে আর পায় কে? তাইত বলিতেছিলাম ভারতেরও দুর্দ্দশা সর্ব্বকাল এইরূপেই পরিণত হইবে। এখন ভাবো দেখি রামমোহনের সে "ব্রহ্মসভা" কোথায়? এক টুক্রা "আদিতে" এক টুক্রা "নববিধানের" শাখা প্রশাখায়, আর এক টুক্রা জলে, স্থলে অনলে নয় কি?

এ দিকে আবার মতের বেগ ফিরিয়াছে; প্রায় ১৭ বৎসর গত হইল এক নগ্ন সন্ন্যাসী বেদের ধুয়া ধরিয়া ধর্ম্ম প্রচারে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, পুরাণে, কোরাণে, বাইবেলে যাহা নাই বেদে তাহা আছে, অবধারণতার সহিত তাহা শ্রবণ করিলে প্রকৃতির প্রকৃত ছবি তাহাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। বোম্বাই নগরের বুদ্ধিমান লোকেরা তাহা শুনিয়া চমকিত হইলেন, ক্রমে ইউরোপ আমেরিকায় সে সংবাদ গেল। এই সময় "কাউণ্টেস্ ব্ল্যাভাট্স্কী" আর "কর্ণেল অল্কট্" আর্য্যবিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছিলেন। তাঁহারা তাহা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন, তাই স্বামী দয়ানন্দের চরণতলে বসিয়া সামগান শুনিবার জন্য ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আর্য্যসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। সেখানে কেবল বেদ পাঠ হয় না, হোমের শিখা উঠিতে দেখিয়া বিস্ময়সাগরে ভাসিয়া গেলেন, "পুনর্জন্ম" কথা নূতন শুনিলেন তাহাতে তাঁহাদের গাত্র সিহরিয়া উঠিল, ভাবিলেন এখানেও কুসংস্কারের ছায়া রহিয়াছে, সুতরাং বিরত হইয়া theosophical society "তত্ত্বসভা" নাম দিয়া এক অভিনব সভা সংস্থাপিত করিলেন। তাহাতে দলে দলে লোক জুটিতে লাগিল, প্রথম প্রথম ইহারা প্রকাশ্য ভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত বেদ ছাড়িয়া বৌদ্ধ গ্রন্থ আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার কিছু দিন পরেই তত্ত্বসভার গুপ্ত গহ্বরে ভয়ানক অভিনয় হইয়া গেল। আবার লোকের মনের গতি ফিরিয়া আসিয়া আর্য্য দর্শনে আস্থা দেখাইল। পুরাণতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, ভাগবততত্ত্ব, "তত্ত্ব সভায়" পঠিত হইতে লাগিল, তবে প্রভেদ এই যে, পুরাকালে বৌদ্ধাচার্য্যেরা যেরূপে আর্য্যশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, ইহাদিগের মধ্যে ইউরোপের নাস্তিক দল আর্য্যশাস্ত্রের সেইরূপ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। সে কালে বৈশ্যেরা যেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের নির্য্যাতন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বৌদ্ধ গুরু "শাক্যসিংহের" পদানত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালেও তেমনি "কৃতবিদ্য শূদ্র দল" সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের শরণাগত হইতে গেলেন। একদিন ব্রাহ্মসমাজ যেমন বর্ণগত পার্থক্য অনুদার বলিয়া তাহার উচ্ছেদ করিতে গিয়াছিলেন, ইহারাও তেমনি গুণ কর্ম্মের ধুয়া ধরিয়া উত্তম বর্ণ লাভ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহা কি সম্ভবে? এই টুকু বিচার করিতে না পারিয়া "তত্ত্বসভার" সভ্যেরা মহাভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা এখন তাঁহাদিগকে কে বুঝায়? সে সময় মহাকালের গর্ভে এখনও শয়িত রহিয়াছে।

ক্ষত্রকুলাভিমানী শাক্যসিংহ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম লোপ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণবংশধর কুমারিল ভট্ট এবং দাক্ষিণাত্যের যোগজীবন শঙ্করাচার্য্য তাহার প্রতিবিধান করেন, ক্ষত্রকুলধুরন্ধর "বাবা নানক" ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বিলোপ করিতে চেষ্টা পান, ব্রাহ্মণকুল-

তিলক গুরুগোবিন্দ সিংহ, অম্বিকা দেবীর চরণে মস্তক অবনত করিয়া শিখ সম্প্রদায়ের গতি ফিরাইয়া দেন। ব্রাহ্মণকুলোজ্জলকারী রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উজ্জলতর রত্ন উদ্ধার করিয়া অজ্ঞানান্ধ সংসারে জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ করেন, শূদ্রকুমার অক্ষয়কুমার মধ্যপথে তাহার বিঘ্ন জন্মান, তাহার পর তাঁহার পদানুসরণ করিয়া অম্বষ্ঠসন্তান কেশবচন্দ্র তাহা আরও বিকৃত করিয়া ফেলেন। ব্রাহ্মণ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের জন্য যত্ন করেন। ইউরোপীয় তত্ত্বসভার অধিনায়ক "অল্‌কট" এবং অধিনায়িকা "এ্যানি বেশাণ্ট" তাহার অন্তিম চিন্তা অস্বাভাবিক ভাবে নীয়মান করিতে প্রয়াস পাইয়া আমার উপরোক্ত বাক্যের সত্যতা সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করিতেছেন। অতএব এ বিষম সময়ের বিষম সমস্যা। সমস্ত কৃতবিদ্য শূদ্রেরা এখন ইঁহাদিগের অনুচর, তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি কম নহে, কল কৌশলও ক্ষীণতর নহে, তাহাতে ধন মানের চাক্‌চিক্য দেখিয়া মরীচিকা প্রাপ্তে তৃষ্ণাতুর মৃগের ন্যায় দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ প্রলোভিত হইয়া তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছেন না যে পরিণামে তাঁহাদের জাতীয় সর্ব্বস্ব কিরূপে অন্তর্হিত হইতেছে। দয়ানন্দী আর্য্য সমাজেও এ বিপদের আশঙ্কা কম নহে। অনেক ক্ষীণবুদ্ধি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়সন্তান তাই পদমর্য্যাদাপূর্ণ শূদ্রদিগের বাক্‌চাতুরীতে পতিত হইয়া তাঁহাদের জাতীয় উদ্দেশ্য তাঁহারাই বিপথে নীয়মান করিতেছেন। এখন এ জাতি সাধারণ বিপ্লবের সময় কে কর্ণধার হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবে? তাই ভাবিয়া সকল প্রকার সংক্রামক রোগাক্রান্ত সমস্ত আধুনিক সমাজের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া আমরা "ভারতে স্বাধীন আর্য্যমিশন" নাম দিয়া এক ভ্রাতৃ-সম্মিলনী সংস্থাপন করিতেছি; ইহাতে সকল বর্ণের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সমান অধিকার থাকিবে। বেদ ইহার ভিত্তি ভূমি হইবেন, মনু তাহার আচার্য্য হইবেন এবং ভারতীয় আর্য্যজাতি আপন আপন বর্ণানুযায়ী কুলধর্ম্ম রক্ষা করিয়া ইহার পুষ্টিসাধন করিবেন।

১। ব্রাহ্মণ—শাস্ত্র ব্যবসায়ী থাকিয়া ধর্ম্মাধিকরণে অধিকারী থাকিবেন।

২। ক্ষত্রিয়—স্বধর্ম্ম পোষণের নিমিত্ত সত্য, ন্যায় ও নীতির বলবৃদ্ধি করিয়া আপদ কালে, রাজ্য, ধর্ম্ম এবং সমাজকে রক্ষা করিবেন।

৩। বৈশ্য—ব্যবসা, বাণিজ্য কার্য্য ধর্ম্মানুসারে সম্পন্ন করিয়া সকল বর্ণকে পোষণ করিবেন।

৪। শূদ্র—স্থির ধীর বিনীত থাকিয়া আপন আপন জ্ঞানানুসারে সকল বর্ণের সেবা করিবেন।

অনার্য্য বর্ণ আর্য্য ধর্ম্মের অনুশাসন রক্ষা করিতে চাহিলে শূদ্রবর্ণের সহিত মিলিত হইয়া সংসার ধর্ম্মের পুষ্টিসাধন করিবেন। ব্যবসা ও যোগ্যতানুসারে সেই সেই শাখা বর্ণের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিবেন।

শাখা শূদ্রবর্ণ।

বিশুদ্ধ।

১। বৈদ্য, কায়স্থ, গোয়ালা, মদক, নাপিত, গোটুয়া, বারুই, মালী, কুমার, তেলী, কর্ম্মকার স্বর্ণবণিক, শঙ্খবণিক, গন্ধবণিক, কাংশ্যবণিক, তাম্বুলী।

মধ্য।

২। কৃষাণ, মাজো, ধীবর, তাঁতী, কাষ্ঠকার, কলু।

অন্ত্যজ।

৩। বাদ্যকার শুঁড়ী মুচী হাড়ি রজক ডোম চণ্ডাল কাহার (বেয়ারা কাওয়া) বেশ্যা।

শ্রীসারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপে।

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় প্রতিষ্ঠিত বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিগত দুই সপ্তাহকাল বাস করিয়া প্রাণ এতদূর মুগ্ধ ও উপকৃত হইয়াছে যে, তৎসম্বন্ধে হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আনুপূর্ব্বিক এই পত্র খানা তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত করিলে কৃতার্থ হইব।

যে দিন শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা সংবাদ প্রথম শ্রুতিগোচর হইয়াছিল, সেই দিন হইতেই এই পবিত্র আশ্রমে সাধনার্থীরূপে কিছুকাল নির্জ্জনে বাস করিতে প্রাণে এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছিল। দুঃখের বিষয়, এই দীর্ঘকালের মধ্যে সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার কোন সুযোগই ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু এখন করুণাময় বিধাতাকে ধন্যবাদ যে, তিনি সেই দীর্ঘকালের বাসনা পূর্ণ করিয়া এ দীনদাসকে কৃতার্থ করিলেন। এই আশ্রম সম্বন্ধে যখনই যে সংবাদ সাধারণে প্রকাশিত হইয়াছে, তখনই তাহা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি।

প্রায় তিন সপ্তাহকাল দেওঘরে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের গৃহে অতিথি ভাবে অবস্থিতি করিয়া ছিলাম।

তাঁহার মধুর সস্নেহ ব্যবহারে ও পবিত্র সহবাসে আমি প্রচুর শিক্ষাও আনন্দ লাভ করিয়াছি। দেওঘর হইতে শান্তি নিকেতনে আসিয়া উপস্থিত হই। আশ্রমে ৩।৪ দিন মাত্র থাকিয়াই অন্যত্র যাইব সঙ্কল্প করিয়া ছিলাম। কিন্তু তাহার নির্জ্জনতা পবিত্রতা, ও সৌন্দর্য্য প্রাণকে এমনই মুগ্ধ করিয়া ফেলিল যে, দুই সপ্তাহকাল থাকিয়া যাইতে বাধ্য হইলাম। তবুও যেন প্রাণের পিপাসা মিটিল না।

দিগন্তপ্রসারিত বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে এই সুন্দর আশ্রমটী প্রতিষ্ঠিত। চতুর্দ্দিকে বিশুদ্ধ বায়ু ধুধু করিয়া নিয়ত নৃত্য করিতেছে। স্থানটি শুষ্ক, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যপ্রদ। বিবিধ কারুকার্য্য শোভিত, লৌহ কাচময় সুন্দর ব্রহ্মমন্দির ও রমণীয় দ্বিতল আশ্রম গৃহ, নানা বৃক্ষলতা পরিবেষ্টিত বাগানের বক্ষে শোভা পাইতেছে। মধ্যে মধ্যে বৃক্ষতলে সাধনাসন ধ্যানার্থীদিগকে ব্রহ্মসত্তা সাগরে অবগাহন করিতে নীরব ভাষায় আহ্বান

করিতেছে। আশ্রমের পশ্চিম প্রান্তে ছাতিম বৃক্ষতলে ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবের সিদ্ধাসন প্রাণে স্বর্গীয় আশা ও গভীর যোগ তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য অবস্থিতি করিতেছে। উপরে বৃক্ষ শাখায় "কর তাঁর নাম গান" পাঠ করিয়া আর কে নীরব থাকিতে পারে? ;ফলতঃ স্থানটি নির্জ্জন ব্রহ্মযোগ সাধনের অতি উপযোগী। আশ্রমের বৃক্ষলতা মন্দির, ও চূড়াস্থিত ওঁ তৎসৎ প্রভৃতি বাক্যাবলী সকলে যেন অনাহত ধ্বনিতে শ্রীমন্মহর্ষি দেবের অনাসক্ত বৈরাগ্য ও অধ্যাত্ম যোগের তত্ত্ব নিয়ত উপদেশ করিতেছে। শরীর অপেক্ষা মন তদপেক্ষা আত্মাই শ্রেষ্ঠ, সেই আত্মার উন্নতি সাধন পক্ষে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজ্যপাদ যথার্থই আমাদের ধর্ম্ম পিতার কার্য্য করিয়াছেন। আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন আত্মার হিরণ্ময় কোষে সেই প্রাণস্য প্রাণের সঙ্গে যোগ, সিদ্ধযোগীর শান্ত সমাহিত প্রশান্ত ভাব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ :সত্য আশ্রমের প্রত্যেক বস্তুর ভিতর দিয়া যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। আমাদের ন্যায় পাপে তাপে উত্তপ্ত, সংসার কোলাহলে অস্থির তরলমতি চঞ্চলাত্মাদের পক্ষে এস্থান যথার্থই শান্তি নিকেতন স্বরূপ। একে নির্জ্জনতা ও পবিত্রতা আশ্রমটিকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে আবার ইহা পূজ্যপাদের সাধন ভূমি, সুতরাং এই দুইএর সম্মিলনে আশ্রমটি আমাদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার মনোহারিত্বের সঙ্গে সিদ্ধিস্মৃতি জড়িত হইয়া যে আত্মাকে ব্রহ্মযোগলিপ্সু করিয়া তুলিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? যে ভূমি এই প্রকারে জীবাত্মার প্রজ্ঞা চক্ষুর সমক্ষে পরমাত্মাকে উজ্জলরূপে প্রকাশিত করে এবং প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মা পরম দেবতার সঙ্গে নিগূঢ় অধ্যাত্ম যোগে যুক্ত হইতে জীবনকে উদ্বুদ্ধ করে, তাহাকে পবিত্র তীর্থ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? যে প্রশান্ত ঋষিভাব, অতুল সম্পদ রাশির মধ্যেও যে নির্লিপ্ততা ও যে গভীর অধ্যাত্ম যোগতত্ত্ব বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীকে শিক্ষা দিতে পূজ্যপাদ আহৃত এই শান্তি নিকেতন যেন সেই আধ্যাত্মিকতার প্রতিকৃতি। বলিতে আনন্দ হইতেছে, এই পুণ্যভূমি সেই সব স্বর্গীয় শিক্ষাদানে এ দীনাত্মাকে বঞ্চিত করে নাই। পূজ্যপাদের পদাঙ্কানুসরণ ভিন্ন এই সব মহারত্ন প্রাণ লাভ করিতে পারিবে না। আর পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে প্রাণ যেমন ব্রহ্মযোগে যুক্ত হইবে, তেমনি ব্রহ্মের ভিতরে পূজ্যপাদ ধর্ম্মপিতার সঙ্গে মিলিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করিবে। শান্তি নিকেতনে যে কয়েক দিন ছিলাম অধিকাংশ সময়েই পূজ্যপাদের জীবনের এই বিশেষভাব ও মহত্ত্ব চিন্তা করিয়াছি, তাঁহার জীবনের শিক্ষারূপ তীর্থবাসে থাকিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রায় প্রতিদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ ও ব্যাখ্যান পাঠ করা গিয়াছে। পূজ্যপাদের প্রিয় উপনিষদ ও গীতা প্রতিদিন কিছু কিছু পঠিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, দুই সপ্তাহ শান্তি নিকেতনে থাকিয়া প্রভূত কল্যাণ ও আনন্দলাভ করিয়াছি। যাঁহার কৃপায় এই আনন্দ ও স্বর্গীয় শিক্ষা পাইলাম, সর্ব্বাগ্রে সেই পরম প্রভু পরমেশ্বরের চরণে কৃতজ্ঞতা বশত প্রণিপাত করি। এই উপলক্ষে ভক্তি ভাজন ধর্ম্ম পিতা মহাশয়ের শুভাশীর্ব্বাদ কামনা করি। শান্তি নিকেতনের নির্জ্জনবাসে যেশিক্ষা হইল তজ্জন্য তাঁহার চরণেও ভক্তি ভরে বারম্বার প্রণাম। তিনি এ দীন দাসকে আশীর্ব্বাদ করুন।

মন্দিরে প্রতিদিন দুইবেলা নিয়মিত উপাসনায় যোগ দান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি। আশ্রমধারী পণ্ডিত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ স্বামী মহাশয় অতি সহৃদয়ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্য পরায়ণ। উভয়ের সঙ্গে সর্ব্বদা একত্র উপাসনা প্রার্থনা ও সৎপ্রসঙ্গ করিয়া পরম আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি। অতিথি অভ্যাগতের প্রতি ইহাঁদের মধুর ও সদ্ব্যবহারের জন্যও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আশ্রমের ভৃত্যদের ব্যবহারেও পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। আশ্রমে অতিথি অভ্যাগতের প্রতি যত্ন ও সমাদরের যথোচিত সুব্যবস্থা রহিয়াছে। পূজ্যপাদ মহর্ষিদেব যে উদ্দেশ্যে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা ;করিয়াছেন, ঈশ্বর কৃপায় তাহা সুসিদ্ধ হউক। পরম পিতা পরমেশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবি করিয়া আমাদিগকে তাঁহার পদানুসরণ করিতে সক্ষম করুন। আমরা ব্রহ্ম সহবাস রূপ শান্তিনিকেতনে পরমশান্তিতে অবস্থিতি করি। পুনরায় প্রভু পরমেশ্বর ও পূজ্যপাদ ধর্ম্ম পিতার শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া বিদায় হই।

ওঁ ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং।

৩২ এ শ্রাবণ ১৩০৩ সাল।	শ্রদ্ধাবনত— শ্রীরাইচরণ দাস পূর্ব্ববাঙ্গলা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ঢাকা।

বিজ্ঞাপন।

আদি ব্রাহ্ম-সমাজের গৃহ-সংস্কার জন্য বিগত ১৮ই আষাঢ় বুধবার হইতে সাপ্তাহিক ও মাসিক ব্রহ্মোপাসনা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে হইতেছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

শারদীয় পূজা উপলক্ষে আগামী ২৫শে আশ্বিন শনিবার আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় বন্ধ হইবেক। অতএব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট সানুনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা তাঁহাদিগের স্বস্ব দেয় টাকা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইতি মধ্যে সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন ইতি।

শ্রীপ্রসন্নকুমার বিশ্বাস।
সহকারী সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৭ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার কালনা ব্রাহ্মসমাজের উনত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ও সায়ংকালে ব্রহ্মোপাসনা, ব্রহ্মসঙ্গীত ও ব্রহ্মসংকীর্ত্তন হইবে। ভক্তগণ ও দর্শক মহাশয়েরা যথা সময়ে আসিয়া যোগদান ও দর্শন করিবেন।

শ্রীবিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক শনিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ত্রিচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ ৩টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৭টার সময়ে ঈশ্বরোপাসনা হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭, শ্রাবণ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৪৮১২৶৯
পূর্ব্বকার স্থিত	৩২৯৫।৶৬
সমষ্টি	৮১০৭॥৶৩
ব্যয় ...	৪১৪০৸৶৩
স্থিত ...	৩৯৬৬৸০

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	২৯৫৭৵৯
দফে উক্ত মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
	৩৪৫৭৵৯
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত ...	৫০২॥৶১
	৩৯৬৬৸০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৪২৯৭॥৶৯
মাসিক দান।	
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	২৮০৲
এককালীন দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	৪।০
চারিকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ বিক্রয়ের মূল্য	৩৫১৩৷৶৯
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ক্রয়	৫০০৲
	৪২৯৭॥৶৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১২৲
৺ বাবু জয়গোপাল সেন, কলিকাতা	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, ঐ	১৸০
„ „ কুঞ্জলাল মল্লিক, ঐ	৩৲
„ „ গোপালচন্দ্র দে, ঐ	৲
„ „ ক্ষেত্রমোহন ধর, ঐ	১৲
„ „ দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, ঐ	২।০
„ „ রামলাল বসু ঐ	২৲
	১২৲
পুস্তকালয়	৪।৶০
যন্ত্রালয়	৪৯৩৲
গচ্ছিত	৩॥৴০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	১॥০
সমষ্টি	৪৮১২৶৯

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৩৮৬৮॥০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩১।৶৯
পুস্তকালয় ...	৩৮।৴৯
যন্ত্রালয় ..	১৯৯॥৶৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	২৸৴০
সমষ্টি	৪১৪০৸৶৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দ্দশ কল্প।

দ্বিতীয় ভাগ।

৬৩৯ সংখ্যা। কার্ত্তিক ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭। ১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বরই অমৃতত্বকামনার পরিসমাপ্তি।

"য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি" যাঁহারা এই পরব্রহ্মকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন। ঋষিরা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া আজিও আমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছেন যে "য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি" যাঁহারা ইহাঁকে জানেন তাঁহারা অমর হয়েন। মনুষ্যের হৃদয়ে অমর হইবার, অমৃতত্ব লাভ করিবার একটা চিরনিহিত আকাঙ্ক্ষা আছে। মানব জানে যে তাহার জীবনে যদি কোন ঘটনাকে নিশ্চিত বলা যাইতে পারে, তবে তাহা এই যে, তাহার মৃত্যু হইবেই। কিন্তু মনুষ্য কি সেই মৃত্যুর কথা শুনিয়া দাঁড়াইয়া থাকে? সে চায় যে, যতদিন সে বাঁচিয়া আছে, তদপেক্ষা এক দিন হউক, এক ঘণ্টা হউক, এক মুহূর্ত্তও অধিক কাল কিপ্রকারে বাঁচিতে পারে। এই জীবনমৃত্যুর ভীষণ সংগ্রামক্ষেত্র সংসারে আমরা দেখি যে, লোকে বাঁচিতে পারিলে মরিতে চাহে না। ইহাতে এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে লোকে মৃত্যু প্রার্থনা করে না, অমরত্ব প্রার্থনা করে। এই অমরত্বের আকাঙ্ক্ষার মূলে আত্মার অমরত্ব-প্রার্থনা বিদ্যমান আছে। লোকে জানে যে এই শরীর একদিন ধরাশায়ী হইবেই কিন্তু তথাপি তাহাদের হৃদয় হইতে যে অমরত্ব লাভের জন্য গভীরনিহিত প্রার্থনা উত্থিত হয়, তাহার কারণ এই যে, সকলেরই হৃদয়ে অবিনশ্বর আত্মার অস্তিত্ব-জ্ঞান এবং সেই সঙ্গে অমৃতের প্রস্রবণ ও আত্মার অন্তরাত্মা পরমাত্মারও অস্তিত্বজ্ঞান গভীররূপে নিহিত আছে।

এই আকাঙ্ক্ষার শান্তি হইবে কোথায়; কোন্ পথে গেলে অমৃতভাণ্ডার আমার নিকটে উন্মুক্ত হইয়া যাইবে; এমন কোন্ লোক আছে, "জরা নাহি, শোক নাহি, মরণ নাহি যে লোকে?" তৃষ্ণা দিয়া যিনি তাহার শান্তির উপায় করিয়া দিয়াছেন, ক্ষুধা দিয়া যিনি ক্ষুধা-শান্তির উপায় করিয়া দিয়াছেন; প্রাণী-সৃজনের পূর্ব্বেই যিনি প্রাণের উপকরণ সজ্জিত রাখিয়াছেন, তিনি কি আত্মাতে এক গভীর আকাঙ্ক্ষা নিহিত করিয়া দিয়া

তাহার শান্তির উপায় করিবেন না—আমরা যে তাহা হইলে বাঁচিতেই পারিব না। তাঁহার উদার সদাব্রতের কথা কি ব্যক্ত করিব—তিনি ইতি পূর্ব্বেই শান্তির উপায় করিয়া দিয়াছেন; সরল পথে তাঁহার কাছে যাও, দেখিবে যে তাঁহার অমৃত-ভাণ্ডারের দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত; তিনি স্বয়ং আপনাকে দিয়াও ভক্তের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করেন। সেই স্বর্গলোকে গেলেই আমাদিগকে আর ক্ষুধাতৃষ্ণার ভয়ে ভীত হইতে হইবে না; সেই একমাত্র লোক আছে যেখানে জরা শোক নাই, পাপতাপ নাই এবং যে লোকে মৃত্যুরও পরাক্রম ব্যর্থ হইয়া যায়।

"স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি। উভে তীর্ত্বাশনায়াপিপাসে শোকাতিগোমোদতে স্বর্গলোকে॥"

স্বর্গলোকে ভয়ের কারণ কিছুই নাই; জরাকেও কেহ ভয় করে না; বিগত-শোক ব্যক্তি ক্ষুধাতৃষ্ণা অতিক্রম করিয়া স্বর্গলোকে আনন্দিত হয়েন।"

এই স্বর্গলোক আমাদের দূরে নহে; তাহা আমাদের অতি নিকটে—আত্মারই অন্তরে তাহা বর্ত্তমান। এই স্বর্গলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে যখন আমাদের আত্মাতেও দেখিতে পাই, তখনই আমাদের আত্মাই স্বর্গলোক হইয়া উঠে, তাহাই তখন ব্রহ্মধাম হয়। সেই মহান্ পুরুষ অসীম আকাশেও যেমন ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন, তেমনি মানবাত্মাতেও আত্মার অন্তরাত্মা হইয়া সর্ব্বদাই সম্যক্‌রূপে স্থিতি করিতেছেন "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।" কিন্তু মানবাত্মাই তাঁহার প্রিয়তম আসন "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।" মানবাত্মার ন্যায় প্রিয় আসন তিনি আর কোথায় পাইবেন? জড়পদার্থ আপনাকেই আপনি জানে না, ঈশ্বরকে জানিবে কিরূপে? মনুষ্য ব্যতীত অন্য কেই বা আপনাকে আপনি জানে এবং কেই বা জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে জানে? মনুষ্য যেমন তাঁহার নিকট হইতে স্নেহপ্রীতি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মনুষ্যই তাঁহাকে হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রেমভক্তি উপহার প্রদান করিতে পারে, তাই মানবাত্মাই ঈশ্বরের প্রিয়তম বস্তু; ঈশ্বর মানবাত্মাতেই অধিষ্ঠান করিতে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসেন।

এই পরমাত্মা অসীম আকাশেও ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন, মানবাত্মাতেও চির-অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন; তিনি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে বিদ্যমান আছেন বটে, কিন্তু কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া পরম কৃতার্থ হয়েন? যাঁহারা ইহাঁতে নিঃসংশয় হইয়া ব্যাকুল অন্তরে ইহাঁকে দেখিতে চাহেন, তাঁহারাই তাঁহাকে লাভ করিয়া অতুল আনন্দসাগরে ভাসমান হয়েন, কারণ এই আত্মার অন্তরাত্মা হৃদ্গত সংশয়রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন "হৃদা মনীষা মনসাঽভিকৃপ্তঃ।" সেই দেবদেব তর্কের অগম্য। তর্ক তাঁহার নিকটেও পৌঁছিতে পারে না। "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে বর্ণনা করিতে গিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, তর্ক সেখানে দাঁড়াইবে কি প্রকারে?

হে ভ্রাতৃগণ! ভ্রমক্রমে আমরা যেন তর্কের কণ্টকাকীর্ণ পথে ব্রহ্মানুসন্ধানে না যাই। সে পথে যাইলে কেবল কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইবে। সেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ঈশ্বর স্বয়ং যে পথ আমাদিগের অন্তরে থাকিয়া দেখা-

ইয়া দিতেছেন, সেই পথ ধরিয়া চলিলেই অতি সহজেই সংসার উত্তীর্ণ হইয়া উজ্জ্বল ব্রহ্মধামে গমন করিতে পারিব। আমাদের অন্তরে যে ব্রহ্মজ্ঞান নিহিত আছে, তাহাকেই জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া তুলিলেই তাঁহার সাক্ষাৎদর্শন পাইব। এবং এইরূপে তাঁহাকে জানিতে পারিলেই আমরা অমৃতত্বলাভ করিব এবং অমর হইব। তখনই আমাদের আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হইবে। তখনই জানিতে পারিব যে ঋষিরা যে আশাবাণী আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহা কি রূপ পরম সত্য—কেবল আশাবাণী মাত্র নহে।

হে পরমাত্মন্! তুমি স্বয়ং আমাদের নিকটে প্রকাশিত হও। আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা তোমার কিছুই জানিতে পারি না। তুমি আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া, তুমি আমাদের শিক্ষাগুরু হইয়া আমাদের জ্ঞানকে উন্নত করিয়া দাও, প্রীতিকে উজ্জ্বল করিয়া দাও। আর তোমার নিকট কি প্রার্থনা করিব—এই প্রার্থনা সফল কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সত্যলাভের উপায়।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।)

এইরূপ অন্যান্য প্রকারের হৃদয়গত উৎকর্ষও সত্যলাভের জন্য আবশ্যক; তজ্জন্য কৌতূহলের প্রয়োজন, শ্রদ্ধার প্রয়োজন, সত্যের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ আবশ্যক এবং সহানুভূতির পরিধি সমুদ্রের ন্যায় দিগন্তপ্রসারিত হওয়া আবশ্যক। মহামুনি শাক্যসিংহের যদি জগতের প্রতি অসীম মমতা না থাকিত, তবে তিনি কখনই রাজ্যসুখ তুচ্ছ করিয়া সত্য নির্ণয়ের নিমিত্ত উদাসীনের বেশ ধারণ করিতেন না, এবং কর্ম্মফলের অখণ্ডনীয় নিয়মও জগতে প্রচার করিতে পারিতেন না। অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন ঋষিগণের সত্যের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল বলিয়াই, তাঁহারা অসার বস্তু সকল উপেক্ষা করিয়া, সজ্জন ছাড়িয়া নির্জনে যাইয়া অবস্থিতি করিতেন এবং তথায় বসিয়া বসিয়া অহোরাত্র "ইষ্টঞ্চ কেবলং জ্ঞানং" এই মহামন্ত্র জপ করিতেন। ফলত যাঁহারা সত্য প্রচার করিয়া পৃথিবীর অন্ধকার অপসারিত করিয়া গিয়াছেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষদিগের বিষয় যতই আলোচনা করা যায়, সত্যলাভের জন্য হৃদয়গত উৎকর্ষের প্রয়োজনীয়তা ততই হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে।

অধ্যবসায় সত্যোদ্ধারের তৃতীয় সহায়। উদ্যমমাত্রেই যে প্রকৃতির প্রিয় নিকেতনের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে এরূপ আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। প্রকৃতির দ্বার উদ্ঘাটন করা বড় সহজ নহে; ইহাতে যে কত বাধা পাইতে হয়, কতবার যে বিফলমনোরথ হইতে হয় তাহার নিশ্চয় নাই। এই কারণে, প্রথম প্রতিঘাতেই যাহার উদ্যম ভঙ্গ হয়, হৃদয় অবসন্ন হয়, তাহার দ্বারা কখনও সত্যোদ্ধার হইয়া উঠে না। প্রখরা ধীশক্তি থাকিলেই বা কি ফল, হৃদয়ের উৎকর্ষ থাকিলেই বা কি লাভ, যদি তৎসঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় অধ্যবসায় না থাকে? বাস্তবিক অধ্যবসায় যে কি একটী মহতী শক্তি তাহা বুঝাইয়া দেওয়া অতি দুষ্কর। উহা মানসিক জগতের স্পর্শমণি, যখন যে বৃত্তির সংশ্রবে আইসে, উহা তখনি সেই বৃত্তিকে দেদীপ্যমান করিয়া তুলে। উহা সর্ব্বপ্রকার অভাব পূরণ করিতে

সমর্থ। বুদ্ধিবৃত্তি স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণ না হইলেও, অধ্যবসায়ের অলৌকিক বলে উহা ক্রমশই উজ্জ্বল হইয়া আইসে; হৃদয়গত উৎকর্ষ লাভের পথে শত অন্তরায় থাকিলেও অধ্যবসায়ের স্বর্গীয় প্রভাবে ক্রমে ক্রমে তাহারা সকলেই তিরোহিত হইয়া যায়, এবং হৃদয় পূর্ণ বিকশিত হইয়া প্রোৎফুল্ল কমলের ন্যায় এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া থাকে। এবং যে সকল তত্ত্ব মানব বুদ্ধির অগম্য বলিয়া বহুকাল হইতে অবধারিত হইয়া রহিয়াছে, অধ্যবসায় থাকিলে, তদীয় অচিন্তনীয় বলে তাহারাও করতলস্থ আমলকবৎ মানবের আয়ত্ত হইয়া, পৃথিবীতে অমরাবতীর শোভা ছড়াইতে থাকে। এই যে আজ আমাদের পরম প্রীতিভাজন ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু, সহায়সম্পত্তিহীন হইয়াও তড়িৎ সম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া, বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করিলেন, তাহা কিসের বলে? যাঁহারা জানেন তাঁহারা নিশ্চয়ই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন—অধ্যবসায়ের বলে। যদি একজনের অধ্যবসায়ের বলেই বাঙ্গালীর নাম, বাঙ্গালীর গৌরব, সুদূর ইংলণ্ড ও আমেরিকাতেও প্রতিধ্বনিত হয়, তবে সকলে সমবেত হইয়া অধ্যবসায় সহকারে সত্যাবিষ্কারের চেষ্টা করিলে, বঙ্গের দুর্দ্দশা ঘুচাইতে কতক্ষণ? বস্তুতঃ যাঁহারা সতত "মন্ত্রং বা সাধয়েয়ম্ শরীরম্ বা পাতয়েয়ম্" এই মন্ত্র জপ করেন, তাঁহারা কি না করিতে পারেন?

আলোচনা সত্যোদ্ধারের চতুর্থ সহায়। ভ্রমপ্রমাদ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মানুষের সিদ্ধান্তে সাধারণত সত্য মিথ্যা মিশ্রিত থাকে। আলোচনা ব্যতিরেকে কোন্ সিদ্ধান্তে কতটুক সত্য কতটুক্ মিথ্যা আছে তাহা নির্ণয় করা যায় না। সুতরাং কোনও বিষয়ে স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণাদি দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহা হইতে সত্যের অংশটুকু ছাঁকিয়া বাহির করিবার নিমিত্ত, অন্যান্যের সহিত তদ্বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া যথার্থ পদ্ধতি অনুসারে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, সত্যোদ্ধারের পন্থা ক্রমশই পরিষ্কার হইয়া আইসে। অনুমান বা স্বয়ংনির্ণীত সংস্কারকে সংশয়ের সীমা অতিক্রম করাইয়া স্থির সিদ্ধান্তে পরিণত করিবার একমাত্র সহায় আলোচনা। অদ্যাবধি যে সকল সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, আলোচনার পর আলোচনা করিয়া মানব তাহাদিগকে লাভ করিয়াছে। যতই অনুশীলন হইবে, যতই আলোচনা করা যাইবে, মিথ্যা সংস্কার ততই তিরোহিত হইয়া সত্যের অংশ ততই উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইবে এবং সত্যের মহিমা ততই পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

অহো আলোচনার মহিমা কিপ্রকারে সম্যক্ ব্যক্ত করিব? একবার নিজের সহিত তুলনা করিয়া জ্ঞানগর্ব্বিত ইয়োরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যে ইয়োরোপ একদা অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, আজ সেই ইয়োরোপের এত গৌরব এত প্রভাব কোথা হইতে আসিল? আলোচনা কি তাহার এক মূল কারণ নহে? আর যাঁহারা এক সময়ে জ্ঞানের প্রভায় জগৎ উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বংশধর আমরা যে আজ অজ্ঞানের অন্ধকারময় কূপে ক্রমশই নিমগ্ন হইতেছি, তাহারই বা কারণ কি? আলোচনার অভাব কি ঈদৃশী অবনতির এক প্রধান কারণ নহে?

অতএব এস আমরা সত্যলাভার্থ ব্যাকুল হইয়া পরস্পরের সহিত সরল ভাবে আলোচনা করি, অধ্যবসায় অভ্যাস করিয়া হৃদয়কে পূর্ণ বিকসিত করিতে যত্নবান হই এবং ইন্দ্রিয়গণকে জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ করিয়া সর্ব্বদা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত রাখি, এবং এই উপায় চতুষ্টয়ের সাহায্যে সত্য লাভ করিয়া, জীবন সফল করি। আর নিদ্রিত থাকা উচিত নহে; এখন গাইতে হইবে।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত"

"দেও খুলে জ্ঞান আঁখি, দেও খুলে জ্ঞান আঁখি।" যতদিন জ্ঞান আঁখি না খুলিবে, যতদিন সত্যলাভ না হইবে তত দিন কিছুতেই অন্ধকার ঘুচিবে না, তত দিন "পর দীপ মালা নগরে নগরে,

তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

আরণ্যকাণ্ড।

পঞ্চদশ প্রস্তাব।

(দণ্ডকারণ্য গমন, শূর্পনখার নাসাচ্ছেদ।)

এক সময় ছিল যখন শাস্ত্রনিহিত সত্য সকল স্বকীয় দীপ্তিতেই প্রতিভাত হইত। বাহিরের কোন দোহাই-এর আবশ্যক হইত না। এই জন্য দেখা যায় বেদ ও উপনিষদে সত্যগুলি একভাবে কথিত, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক শাস্ত্রে তাহা অন্যভাবে পরিকীর্ত্তিত। বৈদিক সময়ে অধিক হয় ত "ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে" অর্থাৎ "প্রাচীন কালের ব্রহ্মবিদের মুখে এইরূপ শুনিয়াছি" ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃতি জন্য প্রাচীন ঋষিদিগের পক্ষে এইরূপ দোহাইই পর্য্যাপ্ত হইত। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে হরপার্ব্বতী, কৃষ্ণার্জ্জুন, রামবশিষ্ট ও অবতারাদি কল্পনা না করিলে চলিল না। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপালনের ফলশ্রুতি অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কর্ম্মানুষ্ঠানে কোটি কল্প স্বর্গবাস, অশ্বমেধ যজ্ঞফলে ইন্দ্রত্ব-প্রাপ্তি প্রভৃতির বিস্ময়জনক আধিক্য শাস্ত্রমধ্যে এতই পরিলক্ষিত হয়, যে মনে হয় শাস্ত্রকারগণ ফলশ্রুতির প্রলোভন দেখাইয়া অপেক্ষাকৃত অজ্ঞানান্ধ লোক সাধারণকে বশে রাখিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন এবং সকলকে ধর্ম্মের শান্তিপ্রদ ছায়ার মধ্যে আনিয়া জনসমাজের মঙ্গল সাধনে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সকল পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারগণ ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফললাভের আশাদানে যেরূপ মুক্তহস্ত (যেমন বিশেষ দিনে একবার মাত্র গঙ্গাস্নানে ত্রিকোটি কুল উদ্ধার), তাহাতে ইহাও মনে হয় যে তাঁহারা অন্য কোন নূতন ধর্ম্মের প্রবল বন্যা হইতে বিবেকবিহীন নরনারীকে উদ্ধার করিবার ইহা ভিন্ন প্রকৃষ্ট ও আশুপ্রতিকারক গত্যন্তর দেখিতে পান নাই। তাঁহারা একদিকে নূতন নূতন পৌরাণিক ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়া উপাখ্যান-ছলে ও অবতার-মুখে ধর্ম্মের নিগূঢ় সত্য, বৈদান্তিক রহস্য সাধারণের উপযোগী করিয়া ফলশ্রুতি সহ বলিয়া চলিলেন; অন্যদিকে নিমগ্নপ্রায় মনুষ্যকুলকে উদ্ধার করিবার জন্য তামসিক ও রাজসিক ভাবের সংমিশ্রণে ধর্ম্মকে কতকটা প্রবৃত্তির অনুকূল করিয়া দিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের সোপান ধরাইয়া দিবার জন্য তান্ত্রিক মায়াজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। লোকে যতই কেন ঘৃণিত চরিত্র হউক না, পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যতই

কেন সে লালায়িত হউক না তথাপি তাহাকে পরিত্যাগ করিলে চলিবে না, যে কোন উপায়ে হউক তাহাকে ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে আনা চাই, ইহাই তাঁহাদের লক্ষ্য হইয়া উঠিয়া ছিল। বিকৃত ধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিলে কোন না কোন কালে সে সত্যধর্ম্মের স্বর্গীয় বহ্নি দেখিতে পাইবে, এই আশাই তাঁহারা হৃদয়ে পোষণ করিতেন।

এই যে শারদীয় মহাপূজা, যাহা প্রতি-হিন্দুর প্রাণের সামগ্রী তাহার ভিতরেও তামসিক, রাজসিক ও সাত্বিক ভাবের বিকাশ। এই যে বামাচার বীরাচার প্রভৃতি বিকৃত শক্তি পূজাপদ্ধতি তাহার ভিতরেও শাস্ত্রকারগণের এই গূঢ় অভিপ্রায় লুকায়িত। (প্রকৃত পক্ষে এই উপায়ে লক্ষ্য সাধন যে কতদূর কার্য্যকরী ও সমীচীন হইয়াছিল, ও পরবর্ত্তী সময়ে তাহাতে দেশের মঙ্গল প্রসূত হইয়াছে কি না, তাহা তর্কের বিষয়।) আমরা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে নিম্নের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্য বিষয় বিশদ করিবার চেষ্টা পাইতেছি।

শারদী চণ্ডিকাপূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে
সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি বিশ্রুতিঃ।
সাত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈ র্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ
মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতং।
পাঠস্তস্য জপঃ প্রোক্তঃ পঠেদ্দেবীমনস্তথা
দেবীসূক্তজপশ্চৈব যজ্ঞো বহ্নিষু তর্পণং।
রাজসী বলিদানৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈস্তথা
সুরামাংসাদ্যুপহারৈ র্জপযজ্ঞৈ র্বিনাতু যা।
বিনা মন্ত্রৈ স্তামসী স্যাৎ কিরাতানাস্তু সম্মতা
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈ র্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈরন্যৈশ্চ সেবকৈঃ।
এবং নানাম্লেচ্ছগণৈঃ পূজ্যতে সর্ব্বদস্যুভিঃ
স্বয়ং বাপ্যন্যতো বাপি পূজয়েৎ পূজয়েত বা।

ভাবার্থ; শারদীয় দুর্গাপূজা ত্রিবিধা সাত্বিকী, রাজসী ও তামসী। জপযজ্ঞ নিরামিষ নৈবেদ্য, পুরাণাদিতে দেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন দেবীসূক্ত জপ হোম তর্পণ লইয়া সাত্বিকী পূজা; বলিদান ও সামিষ নৈবেদ্যে রাজসী পূজা, সুরামাংস জপযজ্ঞহীন উপচারে বিনামন্ত্রে কিরাতগণসম্মত তামসী পূজা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি ম্লেচ্ছ ও দস্যুগণ কর্ত্তৃক আচরিত হয়। নিজে বা অন্য দ্বারা এই পূজা সমাধা করিবে।

আমরা ইহা হইতে বুঝিলাম কি। যিনি উন্নত তিনি পূর্ব্বোক্ত বিধানে সাত্বিক মতে দেবীর পূজা করুন। মৎস্য মাংস যাঁহার না হইলে চলে না, তিনি মেষমহিষ রক্তে দেবীর আরাধনা করুন। তাহাতেও যিনি অক্ষম তিনি দেবীকে উপলক্ষ্য করিয়া ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করুন। শাস্ত্রকারগণের কিছু ইহা লক্ষ্য নহে যে সামর্থ্য থাকিলে সাত্বিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া রাজসিক ভাবে, রাজসিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া তামসিক ভাবে দেবীর পূজা করিতে হইবে। আপনার যোগ্যতা ও অধিকার বুঝিয়া লোকে উৎকৃষ্ট মধ্যম বা অপকৃষ্ট উপায় গ্রহণ করুক ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল।

আমরা যতদূর বুঝি ধর্ম্মের সাহায্য লইয়া বৃথা মদ্য মাংসাহারের প্রচলন খর্ব্ব করা তান্ত্রিক শাস্ত্রকারগণের অন্যতম কেন এক প্রধানতম লক্ষ্য ছিল। যাঁহারা বিবেকবলে সংযম অভ্যাস করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের উপরে ধর্ম্মের বন্ধনের যে বিশেষ উপযোগিতা আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিছু পূর্ব্বে দেখিয়াছি লোকে আহার বিহার জন্য বৃথা পশুবধ করিতে পারিত না। নিতান্ত আবশ্যক হইলে পূজার আয়োজন করিয়া বলিদিয়া সেই মাংস ভক্ষণ করিত। তান্ত্রিকেরাও মদ্য

শোধন না করিয়া পান করিতে সাহসী হইত না। ফলে এই হইত যে আড়ম্বর বহুল পূজার আয়োজন করিতে গিয়া অনেকের মাংসাহারের স্পৃহা আপনা হইতেই খর্ব্ব হইয়া আসিত, হয়ত কাহারও দেবভাব বিকশিত হইয়া পড়িত, অনেকের মনে বৈরাগ্যের উদয় হইবার অবকাশ ঘটিত। যাহাদের এ সকল কিছুই হইত না, ইন্দ্রিয়সেবা করিতে গিয়া তাহারাও অজ্ঞাতসারে একবার ঈশ্বরের নাম লইত। যতবার তাহাকে মদ্যমাংস সেবন করিতে হইবে ততবার তাহাকে ঈশ্বরের নাম লইতে হইবে। ইহা কিছু সামান্য সূচনা নহে।

কিন্তু বর্ত্তমানে সে ভাবের অন্তরায় ঘটিয়াছে। লোকে যেমন একদিকে প্রচলিত পৌত্তলিকতার উপর বীতশ্রদ্ধ হইতেছে, তেমনি তাহার স্থলে আর একটি উন্নত ধর্ম্মকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিতে পারিতেছে না। ইহাই সমস্ত বিপ্লবের স্বেচ্ছাচারেরও জাতীয় দুর্গতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা বলিতে চাহেন পুরাতন তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি বীরাচার পশ্বাচার জাগাইয়া তোল, পৌরাণিক জল্পনার প্রতি অক্ষরে বিশ্বাস স্থাপন কর, এদুর্দ্দিন চলিয়া যাইবে, তাহারা সময়ের আহ্বানে নিতান্তই বধির। জ্ঞানের আলোকে চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, এসময়ে জ্ঞানোন্নত ধর্ম্ম গ্রহণ ও তাহাতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ভিন্ন আর কিছুতেই আমাদের রক্ষা নাই। নূতন ধর্ম্ম কিছু বিদেশ হইতে আনিতে হইবে না। বেদ বেদান্ত উদ্ঘাটন কর, জ্ঞানের অন্ন সত্য পাইবে, বিশ্বাসের অনুকূল ধর্ম্ম পাইবে ও সাধনের অনুকূল জাগ্রত দেবতা মিলিবে।

যাক্, এদিকে রাম দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে বলদৃপ্ত বিরাধ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তুমুল সংগ্রামে বিরাধ অবসন্ন হইয়া পড়িল, এবং রামকে সম্বোধন করিয়া ক্ষীণস্বরে কহিল বুঝি নিহত হইলাম। আমি মোহ বশত অগ্রে তোমাকে চিনিতে পারি নাই। তুমি কৌশল্যাতনয় রাম। আমার নাম তুম্বুরু, কুবেরশাপে রাক্ষসমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছি। কুবের আমাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া বলিয়াছিলেন, যখন রাম তোমাকে যুদ্ধে সংহার করিবেন, তুমি গন্ধর্ব্বপ্রকৃতি অধিকার করিয়া পুনরায় স্বর্গে আসিবে। এক্ষণে তোমার কৃপায় এই দারুণ অভিশাপ হইতে মুক্ত হইলাম। বাল্মীকি রামায়ণে এই পর্য্যন্ত আছে। কিন্তু অধ্যাত্মরামায়ণকার এমন সুন্দর সুযোগ ছাড়িলেন না। বিরাধমুখে রামের স্তুতিচ্ছলে একটি সুমিষ্ট স্তব বাহির করিলেন।

> ইতঃ পরং তচ্চরণারবিন্দয়োঃ
> স্মৃতিঃ সদা মেঽস্তু ভবোপশান্তয়ে।
> তন্নামসঙ্কীর্ত্তনমেব বাণী
> করোতু মে কর্ণপুটং ত্বদীয়ং।
> কথামৃতং পাতু করদ্বয়ং তে
> পাদারবিন্দার্চ্চনমেব কুর্য্যাৎ।
> শিরশ্চ তে পাদযুগপ্রণামং
> করোতু নিত্যং ভবদীয়মেবম্।

অতঃপর সংসারজ্বালা শান্তির জন্য তোমার চরণারবিন্দের স্মৃতি যেন আমার অন্তরে জাগরূক থাকে। বাক্য যেন তোমার নামকীর্ত্তন করে। কর্ণ যেন তোমার অমৃত কথা পান করে, হস্তদ্বয় যেন তোমার চরণকমলের অর্চ্চনা করে, মস্তক যেন অবিরাম তোমার পদে প্রণিপাত করে।

বিরাধবধান্তে রামের সহিত শরভঙ্গের সাক্ষাৎ হয়। মুনি রামকে দেখিয়া বলিলেন বৎস! আমি কঠোর তপঃসাধনে সকলের অসুলভ ব্রহ্মলোক অধি-

কার করিয়াছি। ইন্দ্র আমাকে তথায় উপনীত করিবার জন্য এখানে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তোমাকে অদূরবর্ত্তী জানিয়া এবং তোমার ন্যায় অতিথিকে না দেখিয়া তথায় গমন করিলাম না। তুমি ধর্ম্মশীল, তোমার সমাগমলাভে তৃপ্ত হইয়া পশ্চাৎ দেবসেবিত ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিব। অদূরে কুসুমবাহিনী মন্দাকিনী, তুমি উহাকে প্রতিস্রোতে রাখিয়া যাও, সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রম পাইবে। এক্ষণে তুমি মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা কর, "যাবজ্জুহোমি গাত্রাণি জীর্ণং ত্বচমিবোরগঃ" ৫ম সর্গ, ৩৭। ভুজঙ্গ যেমন জীর্ণ ত্বক পরিত্যাগ করে, আমি তোমার সমক্ষে এই দেহ বিসর্জ্জন করিব। এই বলিয়া শরভঙ্গ বহ্নিস্থাপন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কেশাস্থিমাংস ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তিনি ভাস্বর দেহে ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিলেন। অধ্যাত্মরামায়ণকার ঋষিমুখে বলাইলেন—

কোবা দয়ালুঃ স্মৃতকামধেনুরন্যো জগত্যাং রঘুনায়কাদহো।

জগতে রঘুনাথ রামচন্দ্র ভিন্ন, স্মরণমাত্রে কামধেনুর ন্যায় ভক্তের সকল মনোরথ পূর্ণ করিতে পারে, এমন দয়ালু আর কে আছে! অতঃপর সুতীক্ষ্ণের সহিত রামের সাক্ষাৎ হয়। সেখানে তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়া তিনি অগস্ত্যের আশ্রমে উপনীত হয়েন। মহর্ষি তাঁহাদিগকে দেখিয়া কহিলেন তোমরা জানকীকে লইয়া আমাকে অভিবাদন করিতে আসিয়াছ, ইহাতে প্রীত হইলাম, কুশলী হও। সীতা অরণ্যে আসিয়া অতিদুষ্কর কার্য্য সাধন করিতেছেন। স্ত্রীলোকেরা আবহমান কাল হইতে সঙ্গপরিহারে বিদ্যুতের চাঞ্চল্য স্নেহচ্ছেদনে অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা এবং অন্যায় আচরণে বায়ু ও গরুড়ের শীঘ্রতা অবলম্বন করে; কিন্তু তোমার পত্নী সীতা সুরসমাজে দেবী অরুন্ধতির ন্যায় নিতান্তই পতিব্রতা। নিকটে পঞ্চবটী, তুমি যখন এখানে বাস করিতে সঙ্কুচিত হইতেছ, ঐ অরণ্যে গিয়া অবস্থান কর সুখী হইতে পারিবে। অধ্যাত্মরামায়ণকারের মতে সুতীক্ষ্ণ অগস্ত্যশিষ্য ও রামমন্ত্রোপাসক (অগস্ত্যশিষ্যো রামস্য মন্ত্রোপাসনতৎপরঃ)। সুতীক্ষ্ণের স্তব অতিমধুর। তিনি রামকে বলিলেন,

মামদ্য সর্ব্বজগতামবিগোচরস্ত্বং তন্মায়য়া সুতকলত্র গৃহান্ধকূপে, মগ্নং নিরীক্ষ্য মলমুদ্গলপিণ্ডমোহপাশানুবদ্ধহৃদয়ং স্বয়মাগতোঽসি।

রাম! তোমার মায়ায় পুত্র কলত্র সহ গৃহ রূপ অন্ধকূপে নিমগ্ন ও মলপূর্ণ গলিত দেহে বিজড়িত ও মোহপাশবদ্ধ অবলোকন করিয়া, কি তুমি সকলের অগোচর হইয়া স্বয়ং (কৃপাপরবশ হইয়া) আমাকে দেখিতে আসিয়াছ! রাম উত্তর করিলেন, আমি জানি আমার উপাসনাতে তোমার চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, তাই আজি তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি।

(মুনে জানামি তে চিত্তং নির্ম্মলং মদুপাসনাৎ অতোঽহমাগতো দ্রষ্টুং ইত্যাদি)।

অধ্যাত্ম রামায়ণে ইহাও আছে যে অগস্ত্যের সহিত রামের সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বেই অগস্ত্য শ্রীরামভক্ত মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া শ্রীরামমন্ত্র উপদেশ করিতেছিলেন। সুতরাং রামকে আসিতে দেখিয়া তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা সকলে মিলিয়া পূর্ণ ব্রহ্মরূপে তাঁহার স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। ইহার পরে রাম পঞ্চবটী গমন করিলেন। এবং এক সুরম্য পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ঐ

গোদাবরী তীরে সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা কামরূপিণী শূর্পনখা রামের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার সহিত আপনার বিবাহের প্রস্তাব করিল। কিন্তু রাম পরিহাসচ্ছলে তাহাকে কহিলেন, স্ত্রী আমার সন্নিহিতা, তুমি লক্ষ্মণের নিকট যাইয়া আপন অভীষ্ট ব্যক্ত করিতে পার। লক্ষ্মণ কহিলেন আমি রামের আজ্ঞাধীন, তুমি তাঁহারই নিকটে গমন কর। শূর্পনখা আসিয়া আপন মনোবেগ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া রোষভরে বিনাশ কামনায় জানকীর দিকে অগ্রসর হইল। রামের আদেশে লক্ষ্মণ শূর্পনখার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন। ঘোরা নিশাচরী বিস্বরে রোদন করিতে করিতে দ্রুতবেগে বনমধ্যে প্রবেশ করিল। এবং জনস্থানের সন্নিহিত হইয়া স্বীয় ভ্রাতা খরকে রামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। খর বিপ্রঘাতক চতুর্দ্দশ রাক্ষসকে রামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিল। কিন্তু তাহারা রামের অপ্রতিহত তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া একে একে ধরাশায়ী হইল। খর সাতিশয় কুপিত হইয়া দূষণকে সঙ্গে লইয়া চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের সহিত রামবিনাশে অগ্রসর হইল। ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রাম ও লক্ষ্মণের প্রচণ্ড অস্ত্রবর্ষণে ক্ষণকালের মধ্যে রাক্ষসসৈন্য নির্ম্মূল হইয়া গেল। খর ও ত্রিশিরা অবশিষ্ট রহিল। রাম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তিন বাণে ত্রিশিরার তিন মস্তক ছেদন করিলেন। রাক্ষস সধূম শোণিত উদ্গার করিতে করিতে রণস্থলে নিপতিত হইল। খরও বহুক্ষণ সংগ্রাম করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিল। অকম্পন নামে এক রাক্ষস অবশিষ্ট ছিল। সে জনস্থান পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে লঙ্কায় গিয়া রাবণকে সংবাদ দিল। রাবণ সম্মুখসমরে রামলক্ষ্মণ বিনাশের প্রস্তাব করিলে অকম্পন কহিল আপনি কিছুতেই তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না। সীতা নামে রামের এক সুরূপা পত্নী আছে। রামকে বিমোহিত করিয়া ঐ স্ত্রীরত্নকে কোনরূপে অপহরণ করুন। স্ত্রীবিয়োগ হইলে সে কখনই প্রাণ ধারণ করিতে পারিবে না। রাবণ তাহাতেই সম্মত হইয়া একমাত্র সারথীকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিল, এবং তাড়কাতনয় মারীচের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিল আমি রামের ভার্য্যাকে অপহরণ করিব, তোমাকে তাহার সাহায্য করিতে হইবে। মারীচ উত্তরে কহিল কে তোমাকে এই কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি দিল। যুদ্ধ করা দূরে থাকুক তুমি রামকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ নহ। রাম মহাবল সিংহ,রণক্ষেত্রে সঞ্চরণ উহার অঙ্গসন্ধি ও কেশর, রণচতুর রাক্ষসমৃগ সংহার করা উহার কার্য্য, শানিত অসি দশন, এবং শরই অঙ্গ; সে এক্ষণে নিদ্রিত আছে, তাহাকে জাগরিত করা তোমার উচিত হইতেছে না। তখন রাবণ তাহার কথা শুনিয়া লঙ্কায় প্রস্থান করিল।

এদিকে শূর্পনখা আসিয়া রাবণের সম্মুখে কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। এবং তাহাকে রামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। রাবণ স্বয়ং যানশালায় প্রবেশ করিয়া এক মনোরথগামী রথে আরোহণ পূর্ব্বক মারীচের আশ্রমে আসিয়া পুনরায় উপস্থিত হইল। এবং কহিল তোমাকে রজতবিন্দুখচিত হিরণ্ময় হরিণ হইয়া সীতার সম্মুখে সঞ্চরণ করিতে হইবে। সীতা তোমাকে দেখিলে নিশ্চয়ই তোমায় গ্রহণ করিবার জন্য রাম ও লক্ষ্মণকে অনুরোধ করিবেন। এবং তাঁহারা

এই কার্য্য প্রসঙ্গে কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে আমি পরম সুখে সীতাকে হরণ করিব। মারীচ উত্তর করিল রাজন্! আমি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞকালীন যুদ্ধে কথঞ্চিৎ রামের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম। পূর্ব্বে মৃগরূপী দুইটি রাক্ষসের সহিত একদা দণ্ডকারণ্যে ঋষিবধ করিতেছিলাম। রাম আমাদিগকে দেখিয়া শরত্যাগ করিলেন, সহচর দুইটি বিনষ্ট হইল। আমি কোনরূপে প্রাণরক্ষা করিয়া যোগী তাপস হইয়া এইস্থানে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া আছি। বলিতে কি তদবধি ভীত হইয়া সতত যেন সহস্র সহস্র রামকে প্রত্যক্ষ করি, সমস্ত অরণ্যই আমার রামময় বোধ হয়। আমি স্বপ্নযোগে উহাঁকে দেখিবামাত্র চমকিত হইয়া উঠি। আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার অনুগমন করিতে পারিব না। রাবণ ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। মারীচ কি করিবে অগত্যা স্বীকৃত হইল। এবং উভয়ে সীতাহরণার্থ বহির্গত হইল।

কিন্তু এদিকে অধ্যাত্মরামায়ণের অরণ্য কাণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে আছে রাম পঞ্চবটী বনে নিজকুটীরে সমাসীন; লক্ষ্মণ তাঁহাকে সবিনয়ে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন ভগবন্! আপনি ভিন্ন ভূমণ্ডলে আর কেহ বক্তা নাই, আপনার নিকট মোক্ষের ঐকান্তিক কারণ শ্রবণ করিতে বাসনা করিয়াছি। রাম কৃপাপরায়ণ হইয়া যাহা বলিলেন তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৈদান্তিক মায়াবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। উপসংহারে রাম একাদশীতে উপবাস, ও রামায়ণ পাঠ ও শ্রবণ, নিজের পূজা ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন মুক্তিপ্রদ বলিয়া উপদেশ দিলেন। পরে শূর্পনখার সহিত রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক তাহার নাসাকর্ণ ছেদিত হইল।

শূর্পনখা আসিয়া খরদূষণাদির মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপনে রাবণকে রামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলে তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, রাম মনুষ্য হইয়া একাকী খরকে কিরূপে সসৈন্যে বিনাশ করিল। অথবা রাম মনুষ্য নহেন, আমাকে বিনাশ করিবার জন্য ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যদি পরমাত্মা রাম আমাকে বিনাশ করেন আমি চিরকালের জন্য বৈকুণ্ঠরাজ্য পরিপালন করিব ও সাযুজ্য মোক্ষ প্রাপ্ত হইব।

"বিরোধবুদ্ধ্যৈব হরিং প্রয়ামি দ্রুতং ন ভক্ত্যা ভগবান প্রসীদেৎ"

বিরোধবুদ্ধিতেই রামের নিকট গমন করিব, যেহেতু ভগবান ভক্তিতে শীঘ্র প্রসন্ন হন না। পরে মারীচের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে মারীচ কহিল, রাম পরমাত্মা তাঁহাতে বিরোধবুদ্ধি করিবেন না, প্রত্যুত ভক্তিভাবে তাঁহার ভজনা করুন তিনি পরম কারুণিক। কিন্তু রাবণ বিরোধ-বুদ্ধির পক্ষপাতী হইয়া মারীচকে মায়ামৃগ সাজিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মারীচও প্রাণভয়ে স্বীকৃত হইল।

অনন্তর রাম রাবণের সেই সমস্ত চেষ্টা জানিতে পারিয়া নির্জ্জনে সীতাকে বলিলেন জানকি! রাবণ ভিক্ষুরূপে তোমার নিকটে আসিবে, তুমি তোমার সদৃশাকৃতিছায়া কুটীরে রাখিয়া অগ্নিতে প্রবেশ কর এবং তথায় অদৃশ্যরূপে এক বৎসর অবস্থান কর। রাবণবধের পর পূর্ব্ববৎ আমাকে প্রাপ্ত হইবে। জানকী তাহাই করিলেন; মায়াসীতা বাহিরে রাখিয়া আপনি অনলে অন্তর্হিতা হইলেন। এবং সেই মায়াসীতা একটি মায়াকল্পিত মৃগ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে রামের নিকটে আসিয়া ঐ কণক-

মৃগ ধরিবার জন্য রামকে অনুরোধ করিলেন।

পাঠকগণ দুই রামায়ণের প্রভেদ দেখিয়া লউন। অধ্যাত্ম-রামায়ণকার এসমস্ত কোথায় পাইলেন তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। অধ্যাত্মরামায়ণকারের হস্তে উপাখ্যানগত ঔৎসুক্য একেবারে নষ্ট হইয়াছে। রামচন্দ্রের সর্ব্বজ্ঞতা বজায় রাখিতে গিয়া পুরাণকারকে ঐতিহাসিক সত্যের অন্যথা করিয়া রামজীবনে স্বকপোলকল্পনা মিশ্রিত করিতে হইয়াছে। কিন্তু দেবত্ব ও ঈশ্বরত্বের সহিত মনুষ্যত্বের এত প্রভেদ যে মনুষ্যকে দেবতা বা অবতার গড়িতে গেলে তালি বা কৃত্রিম অঙ্গসংস্কার সর্ব্বাগ্রেই চক্ষের সমক্ষে নিপতিত হয়!

পুরাতত্ত্ব।

সপ্তগ্রাম।

একদা উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন যখন বঙ্গের গৃহে গৃহে আনন্দের কোলাহল উঠিয়াছে, আমি আমার কয়েক সঙ্গী সমভিব্যাহারে বেলা এক প্রহরের পর সপ্তগ্রামের ভগ্নাবশেষ দেখিতে বাটী হইতে বহির্গত হইলাম। আমার বাটী হইতে হুগলীর ষ্টেসন দেড়ক্রোশ রাস্তা। এই রাস্তা গ্র্যাণ্ডট্রঙ্করোড নামে অভিহিত। তাহার দুই ধারে উন্নত পাদপ সকল দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে উৎকৃষ্ট উদ্যান সকল শোভা পাইতেছে। আমরা সেই রাস্তা দিয়া উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিলাম। ক্রমে মাঠের ধারে পড়িলাম। অনন্ত আকাশ মাঠের প্রান্ত ভাগের সহিত মিলিত হইয়াছে। আর তার চারি দিকে বৃক্ষরাজি। মাঠ যেন হরিদ্বর্ণের মালা গলদেশে ধারণ করিয়াছে। তখন অনন্ত আকাশ ও প্রশস্ত ময়দান পুনঃ পুনঃ অনন্ত দেবকে মানসাকাশে প্রকাশিত করিতে লাগিল। তখন আমি আনন্দভরে সঙ্গীদিগকে শিব সুন্দর পরমেশ্বরের বিষয় বলিতে লাগিলাম। বলিলাম, দেখ, তাঁহারি সৌন্দর্য্যের ছায়া এই তাঁর প্রকৃতিতে প্রতিফলিত হইয়াছে। না জানি তিনি নিজে কি অনুপম সুন্দর। ক্রমে আমরা হুগলী ষ্টেসনে উত্তীর্ণ হইলাম। বেলা একটার সময় কলিকাতা হইতে ট্রেণ আসিল। ভগবানকে স্মরণ করিয়া আমরা গাড়ীতে উঠিলাম। অনতিবিলম্বে ত্রিশবিঘা ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম। ষ্টেসনের অনতিদূরে তাহার পশ্চিমাংশে সপ্তগ্রামের ভগ্নাবশেষ। ইহা হুগলী সহরের ঠিক উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত আছে। ত্রিবেণী হইতে দুইতিন ক্রোশ দক্ষিণে ভাগীরথীর উপর ঐ পুরাতন সহর বিরাজমান ছিল। পূর্ব্বে ভাগীরথী সপ্তগ্রামের পাদমূল বিধৌত করত দক্ষিণ-পশ্চিমবাহিনী হইয়া বঙ্গসাগরে স্বীয় কর প্রদান করিতেন। কালের বিচিত্র গতি। শ্রুত আছি কালে ত্রিবেণীর নিকট ঐ স্রোত মন্দীভূত হইল। ভাগীরথী আর এক নূতন মুখে ঐস্থান হইতে দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন। ইহাকেই এখন আমরা হুগলী নদী বলি। ভাগীরথীর সাবেক ঐ অংশটুকুকে লোকে এখন স্বরস্বতী বলে। আসল যে স্বরস্বতী তাহা পঞ্জাবে ছিল। তাহা কালবশে একণে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। বহুকাল হইতে এই সপ্তগ্রাম হিন্দুরাজাদের রাজধানী ছিল। এক সময়ে সৌভাগ্যরবি উজ্জ্বল কিরণজাল বিস্তার করিয়া তাহার মস্তকোপরি শোভা বিস্তার করিত। এমন

সময় ছিল, যখন রোমীয় অর্ণবপোত সমূহ ভাগীরথী বক্ষে সপ্তগ্রামের সম্মুখে ভাসমান থাকিত। রোমকেরা কার্পাস বস্ত্র লইবার জন্য এই বিখ্যাত নগরীতে বাণিজ্যার্থে আসিত। কালে ইহা আফগানও মোগলদিগের হস্তগত হইয়াছিল। পর্টুগিজেরাও এই বন্দরে প্রবল প্রতাপের সহিত বাণিজ্য করিত। নিকটে হুগলীতে তাহাদের বাণিজ্যের কারখানা ছিল। এই পোর্টুগিজেরা জোর জবরদস্ত করিয়া লোক সকলকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিত। সাজাহান পাতসা সিংহাসনে আরূঢ় হইবার পূর্ব্বে যখন বাঙ্গালায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তিনি স্বচক্ষে এই সকল ব্যাপার দেখিয়াছিলেন। পরে যখন স্বয়ং বাদসাহ হইলেন, তখন কাসিম খাঁর প্রতি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। সুবেদার স্বীয় পুত্র ইনার তুল্লাকে প্রেরণ করিয়া হুগলী অধিকার করিলেন (১৬৩২ খৃঃ) সেই পর্য্যন্ত এদেশে পর্টুগিজদিগের প্রভাব কমিল। হুগলী রাজবন্দর এবং প্রধান বাণিজ্য স্থান হইল। এই সময় হইতেই সপ্তগ্রামের দুঃখের দিন আরম্ভ হইল। আমরা সেই দুর্দ্দিনের তমসাচ্ছন্ন প্রাণহীন সপ্তগ্রাম দেখিবার জন্যই তখন সেখানে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু বুঝিতেই পারিলাম না কোথায় কি ছিল—কোথায় কি আছে। প্রথমেই দেখিলাম জীর্ণ শীর্ণা স্বরস্বতী নদী ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। তাহার উপর ইংরাজ গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক একটি সুন্দর সেতু প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। এমন সময় সম্মুখে একজন কৃষককে দেখিতে পাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম সাত গাঁয়ের ভাঙ্গাচুরা বাড়ীঘর সব কোন্খানে আছে? কোন্দিকে যাইলে তাহা দেখিতে পাই? সে বলিল, কি আর আছে, কি বা দেখ্বেন। যান্ এই উত্তর ধারে আপনার সম্মুখেই পুরাতন কেল্লা, বন জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে। কেল্লার আর কিই বা আছে। আমরা তার কথাপ্রমাণ দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিমুখে যাইতে যাইতে পুরাতন কেল্লার ভগ্নাবশেষ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রথমেই দেখিলাম বহুদূরব্যাপী সুন্দর ছোট ছোট বৃক্ষের ঝোপ নানাবিধি লতাপাতায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে। তাহার মধ্যে মাধবী লতাই বড় মনোহরণ করিয়াছিল। একরূপ সুন্দর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য বিশিষ্ট সাদা ফুল তোড়ায় তোড়ায় বৃক্ষশাখায় জড়িত রহিয়াছে। এবং ভূমিতলে কত যে বন্যফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহা কি বলিব। সেই সমস্ত ফুল হইতে আশ্চর্য্য সুগন্ধ চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে। তাহার আঘ্রাণ লইয়া আমরা বিমোহিত হইলাম। ছোট ছোট পক্ষী সকল এমন আস্তে আস্তে ডাকিতেছে যে তাহা শুনিয়া বোধ হইল যেন তাহারা প্রেমময়ের কানে কানে কি কত প্রেমের গান শুনাইতেছে। এই বনের ভিতর সহজে ভ্রমণ করা যায় না। স্থানে স্থানে লতা সকল পথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। সঙ্গীদিগের সঙ্গে বড় ছুরী ছিল। বিপুল উৎসাহের সহিত সম্মুখস্থ লতা কাটিয়া তাহারা পথ পরিষ্কার করিল। ক্রমে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিবামাত্র শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সহসা মনোমধ্যে ভীতির সঞ্চার হইল, অসূর্য্যম্পশ্য ভূভাগ। কি সুন্দর ছায়ার সমাবেশ!

"কোন জীব কোন কীট তথা নাহি নড়েচে।
মৃত্যুর ভীষণ ছায়া, সর্ব্বস্থানে পড়েছে॥

কাননের পাতা ছাদ, নাচে প্রেম ভরে।
পবন চলিছে তায়, সর্ সর্ স্বরে॥"

আমরা যেন এক লোক হইতে অন্য এক লোকে আসিয়াছি। উন্নত উন্নত পাদপ সকল দেখিয়া মনে হইল, তাহারা যেন জনকোলাহল হইতে পলাইয়া আসিয়া নির্জ্জনে ভগবানের তপস্যায় নিযুক্ত রহিয়াছে। যাইতে যাইতে দেখি প্রকাণ্ড অট্টালিকার প্রশস্ত বনিয়াদ সম্মুখে রহিয়াছে। কে তাহার সমস্ত ইট তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। ভাবিলাম প্রকাণ্ড সর্প তথায় থাকিতে পারে। কিন্তু সঙ্গীরা সাহস পূর্ব্বক ঐ বনিয়াদের গর্ত্তে নাবিয়া, আস্তে আস্তে ক্রমে ক্রমে উচ্চ এক স্থানে উঠিল। আমি তাহাদের অনুবর্ত্তী হইলাম। উঠিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া আবার সরস্বতী নদী দেখিতে পাইলাম। নদীগর্ভ প্রশস্ত বটে, কিন্তু স্রোতস্বতী অতি সংকীর্ণ ভাবে তাহার মধ্যস্থল দিয়া চলিতেছে। ঐ নদীর পূর্ব্বতীরে এমন একটা স্থান দেখিলাম, যে দেখিয়াই বোধ হইল, যেন তথায় অর্দ্ধগোলাকৃতি একটা প্রকাণ্ড ঘাট ছিল। আমি স্থানটিকে অনেক ক্ষণ ধরিয়া দেখিয়াছিলাম। আশ্চর্য্য এই যে তাহারি সন্নিধানে অনেকটা জায়গায় মল্লিকা ও বেলফুলের চারা সকল বর্দ্ধিত হইতেছে। আরো অনেক রক্তবর্ণের ফুলগাছ দেখিলাম। বোধ হইল যেন এক সময়ে এখানে কুসুমোদ্যান ছিল। এইবার আমরা পূর্ব্ব কেল্লার দিকে চলিলাম। যত যাই তত দেখি, কেবল পুরাতন ছোট ছোট ইট ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কোথাও বা ভগ্ন দেওয়াল, কিন্তু কোথাও সমগ্র প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল এক স্থানে একটা মস্‌জিদের প্রকাণ্ড গোল মস্তক শৈবালাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, ইহাই দেখিতে পাইলাম।

এই বার আমরা দক্ষিণাভিমুখে ফিরিলাম। পথি মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কয়েকটা জলহীন সরোবরের খাত দেখিলাম। তাহাদের চতুর্দ্দিক খর্জ্জুর গাছে পরিবেষ্টিত। আবার ঐ বনের ভিতর এমন একটা অনাবৃত স্থান নয়নগোচর হইল যে তাহা কেবল খোলা খাবরা সহিত তৃণসংযুক্ত হইয়া পতিত রহিয়াছে। ইহাতেই বোধ হয় এক সময়ে তথায় অনেক খোলার ঘর ছিল। আরো দেখিলাম নানা জাতীয় বানর তথায় ক্রীড়া করিতেছে। অত্যন্ত পরিশ্রম হওয়াতে বনের ভিতর হইতে বহির্গত হইলাম। বহির্গত হইবার অনতিবিলম্বে একটি লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে আমাদিগকে দেখিয়াই কহিল, তোমরা কি সাহসে বনের ভিতর গিয়াছিলে। আজ তিন দিন হইল, এখানে বাঘ আসিয়াছিল। একটা বাছুর মারিয়া ফেলিয়াছে। শীতকালে বৎসর বৎসর প্রায়ই এখানে বাঘ আসিয়া থাকে। তোমরা এমন কাজ আর করিও না। আমরা তৎকর্ত্তৃক এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া সেতুর উপর দিয়া নদীর পশ্চিম পারে যাইলাম। তথায় যাইয়া দেখি নদীর ঠিক্ উপরে সুন্দর পাকা রাস্তা রহিয়াছে ও তাহার দুই ধারে পুরাতন বড় বড় পাকুড় বৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছে। এখানে আমরা অনেক ক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। তখন প্রদোষ কাল। ক্রমে চন্দ্রমা নির্ম্মল আকাশে দৃশ্যমান হইল। চারিদিকে হৃদয়প্রফুল্লকর জ্যোৎস্না বিকীর্ণ হইল। সেই শুভ্রালোকে আমরা তথায় ভগবানের উপাসনায় নিযুক্ত হইলাম। সংসারের সকলই অনিত্য। যে স্থান এক সময় পার্থিব

সুখ সৌভাগ্যে স্ফীত ছিল আজ তাহার এই দুর্দ্দশা। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। সংসারের এই অনিত্যতা দেখিয়া সেই নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় পুরুষকে প্রাণভরে ডাকিলাম। ঐ গভীর নির্জ্জনতা তাঁহার আবির্ভাব পরিস্ফুট করিয়া তুলিল। সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। আমরা পরিতৃপ্ত হইয়া ষ্টেসনাভিমুখে গমন করিলাম। পরে রাত্রি নয়টার পর পশ্চিম হইতে বাষ্পীয় গাড়ী আসিলে আমরা তাহাতে আরোহণ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

আর একটি কথা আমি এখানে বলিতে বাধ্য হইতেছি। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবেণী সপ্তগ্রামের সৌভাগ্যের সময় ইহারই অন্তর্গত ছিল। আমি তাহা দেখিবার জন্য অন্য আর এক দিন তথায় গিয়াছিলাম। সেখানে যাইয়া দেখিলাম, ভাগীরথী তীরে একটি পাষাণনির্ম্মিত ভগ্ন প্রাসাদ, একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। প্রস্তরনির্ম্মিত বাটীর পাষাণের বৃহৎ ফাটক সম্মুখেই পতিত দেখিতে পাইলাম। তাহাতে এক লৌহ শৃঙ্খল সংলগ্ন রহিয়াছে। লোকে তাহাকে গাজীর কুড়ালি কহে। এই বাটীর দেওয়াল অদ্যাপি অভগ্নাবস্থায় আছে। কিন্তু ছাদ নাই। শুনিলাম কিছু কাল পূর্ব্বে এক সন্ন্যাসী এখানে অত্যন্ত কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। দেওয়ালে দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। কিন্তু প্রস্তরে বাঁধান প্রাঙ্গণ ভূমিতে পারসী অক্ষরে কত কি লেখা রহিয়াছে; ইহাতেই বোধ হইল এই প্রাসাদ বহু পূর্ব্বে হিন্দুদিগের অধিকারে ছিল। পরে মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কাহার না শিক্ষা হয়, যে সৌভাগ্য কাহার ভাগ্যে চিরস্থায়ী হয় না। অতএব কি রাজা কি প্রজা সৌভাগ্যের সদ্ব্যবহার করাই সকলের কর্ত্তব্য।

হে পরমেশ্বর! তুমি সকলকে মর্ত্ত্যধামের অনিত্যতা বুঝাইয়া দিয়া নিরহঙ্কারিতা ও বিনয় শিক্ষা দাও, এই তোমার নিকটে প্রার্থনা।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

(প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান মূলক পদ্য।)

দ্বিতীয় প্রকরণ—চতুর্থ ব্যাখ্যান।

গত পৌষ মাসের পর।

হায়! যবে হৃদয়ের কুটিল কামনা।
আমাদের করে ঘোর বিপথে চালনা॥
তবে অবসন্ন হয় দেহ মনঃ প্রাণ।
তাঁরে ছেড়ে কোথা শান্তি কোথা আছে ত্রাণ॥
আত্মা যবে কলুষিত পাপ-লালসায়।
আপনার দেব ভাব সকলি হারায়॥
অমৃতের পুত্র বলি নাহি থাকে মনে।
বৃথা দিন যায় তার মোহের ছলনে॥
যে জন হৃদয়ে পেয়ে ঈশ্বর দর্শন।
হৃদয়ে শুনিয়া তাঁর মধুর বচন॥
সে বচন অনুসারে তাঁর পথে ধায়।
প্রভুর প্রসন্ন মুখ দেখিবারে পায়॥
দেহে তার দুন বল যোগায় তখন।
প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ হয় দু নয়ন॥
স্বরগের ভাব তার হৃদে বিকশিত।
যাহার সুগন্ধে চারি দিক আমোদিত॥
দেবতারা সেই গন্ধ করিয়া গ্রহণ।
বিমল আনন্দে সবে পুলকিত হন॥
হৃদয়ের গ্রন্থি যাঁর হইয়া মোচন।
করেন অমৃত পথে একান্তে গমন॥
হেন সাধু দেখি মোরা কেন আনন্দিত?
ধর্ম্ম জন্য কেন মোরা হই পিপাসিত?
বুঝে দেখ—যিনি ধর্ম্ম করেন প্রেরণ।
পরম পবিত্র যিনি পুণ্য প্রস্রবণ॥

আমাদের সাধু ভাব করেন মোদন।
নানারূপে সেই ভাব করেন বর্দ্ধন ॥
হৃদয় ভরিয়া প্রেম-ভক্তি-পুষ্প-হারে।
দাঁড়াই যখন তাঁরে পূজা করিবারে ॥
আমাদের পূজা তিনি করেন গ্রহণ।
কৃতার্থ করেন আরো দিয়া আলিঙ্গন ॥
বলিছেন—"বুঝ নর! নিয়তি তোমার।
থাকিবে অনন্ত কাল—সহিত আমার ॥
সংসার তোমার নহে—আমার এ হয়।
আমি এর অধিপতি—জানহে নিশ্চয় ॥
আমার যে কার্য্য ইথে করিবার তরে।
পাঠালাম আমি তোমা ভবের ভিতরে ॥
কর সেই কার্য্য তুমি অনাসক্ত মনে।
তোমারে দিবহে ভৃতি—থাকি তোমা সনে ॥
কিবা সেই ভৃতি? হৃদি আমার দর্শন।
আমার সপ্রেম দৃষ্টি—উৎসাহ জনন ॥
তোমারে যে কার্য্য আমি করিনু বিধান।
বুঝিয়া দেখহে নর! পাইবে সন্ধান ॥
কেবল সুখের ধাম হ'লে এ সংসার।
পাছে তুমি মুগ্ধ হও ইথে অনিবার ॥
তাই এর সুখ সঙ্গে দুঃখের যোজন।
করিয়া দিলাম আমি মঙ্গল কারণ ॥
সংসার মায়ায় তুমি হবে না মগন।
আমাতে তোমার চিত্ত করিবে অর্পণ ॥
মঙ্গল ছায়ায় যিনি করিয়া রক্ষণ।
করিছেন আমাদিগে সর্ব্বদা পালন ॥
পেয়ে যাঁর প্রেমদয়া মঙ্গল কিরণ।
অপার আনন্দে আত্মা করে সঞ্চরণ ॥
যিনি দেন কত আশা ভরিয়া হৃদয়।
আত্মা তাঁর কাছে চির থাকিবে নিশ্চয় ॥
পৃথিবীর মলিনতা সব তেয়াগিবে।
জ্ঞান প্রেম দেব ভাবে ক্রমিক বাড়িবে ॥
মৃত্যু তার অমৃতের হইবে সোপান।
অমৃত ভবনে তার হইবেক স্থান ॥
চির দিন আত্মা তথা অমৃত ভুঞ্জিবে।
তাঁর প্রেম নয়নের সম্মুখে থাকিবে ॥

হে আত্মন্! তাঁরে হেথা কর উপার্জ্জন।
তাঁরে হৃদি লয়ে সেথা করিবে গমন ॥
পাবে তাঁর ধাম নিত্য আনন্দ আলয়।
যথা নাহি শোক তাপ জরা মৃত্যু ভয় ॥
পরম সম্পদ্ লাভ হইবে তোমার।
সে সম্পদ্ তিনি বিনা কিছু নহে আর ॥

ক্রমশঃ।

সাংখ্য স্বরলিপি।

দীর্ঘ ও হ্রস্ব সপ্তক।

আমরা উচ্চ ও নিম্নসপ্তককে এক হিসাবে দীর্ঘ ও হ্রস্ব সপ্তকও কহিতে পারি। কারণ উচ্চ স্বরসপ্তকে স্বর কম্পন বর্দ্ধিত হয় এবং নিম্ন স্বরসপ্তকে স্বরকম্পন হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

এইরূপে, দীর্ঘ ও হ্রস্ব মাত্রাকে আমরা উচ্চ ও নিম্নমাত্রাও কহিতে পারি।

স্বরসপ্তকের জন্য কথার সংক্ষেপ।

সংখ্যার প্রাণ রক্ষা করিয়া অনেক সময়ে আবশ্যক হইলে সংখ্যাবাচক কথায় সংক্ষেপের দ্বারা সপ্তকা (সপ্তক—মাত্রা সমূহ) প্রকাশ করিতে পারা যায়। সপ্তক প্রকাশের সময় মুগ্ধবোধব্যাকরণানুযায়ী প্রথ দ্বিতীয় প্রভৃতির সংক্ষেপ প্রী দ্বী প্রভৃতিকে অনুস্বারযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিব। উচ্চ সপ্তকে উহাদিগের দী "ী" থাকিবে। নিম্ন সপ্তকে হ্রস্ব "ি" হইবে।

মাত্রা প্রকাশের বেলায় প্রভেদ এই যে কেবল উহাদিগের অনুস্বার বাদ যাইবে।

আবৃত্তির চিহ্ন—ইংরাজী I বা i। দ্বিরাবৃত্তির চিহ্ন—দ্বিগুণিত 'আই'। এই আবৃত্তিচিহ্ন আবৃত্ত গীতাংশে দুই দিক বেষ্টন করিয়া থাকে।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

পরমদেব ব্রহ্ম জগজন পিতামাতা।
সেবকে প্রসন্ন হও হে সর্ব্বসিদ্ধি দাতা, থাকে নিত্য তব পদে মতি, এই ভিক্ষা দেহি নাথ।

তালি। ১। ২ঃ (স্থা, অ)। ৩। ০ ॥
মাত্রা। ৪। ৪ । ২। ২ ॥

স্থা ঃ০—II রে রপা ঌমা পা। পধা মা। গা রে। সা$\frac{১}{২}$ রে$\frac{১}{২}$ গা$\frac{১}{২}$ রে$\frac{১}{২}$ সা নিঝিঃ।
স্থা ঃ০—II প র ম দে। — ব। ব্র —। — — — — হ্ম —।
। নি নি পা পসা। নিঝিঃ সা। রে২। গা সা$\frac{১}{২}$ নি$\frac{১}{২}$ সা$\frac{১}{২}$ নি$\frac{১}{২}$ সা II। (অ) ঃ০—সা২ সা স্বা।
২... ... ... ২
। জ গ জ ন। — পি। তা। — মা — — — তা II। (অ) ঃ০—সে ব কে।
। গা মা। পা২। ঌমা পা২ পা। পধা নি ধা পা। ধা মা। মা পা।
। — প্র। স। ন্ন হও হে। স — র্ব্ব সি। — দ্ধি। দা —।
। ধা$\frac{১}{২}$ পা$\frac{১}{২}$ মা$\frac{১}{২}$ পা$\frac{১}{২}$ মা গা। গমা$\frac{১}{২}$ গা$\frac{১}{২}$ মা রে সা$\frac{১}{২}$ নি$\frac{১}{২}$। সা সা। রে পা।
২
। — — — — তা —। থা — — কে নি —। — ত্য। ত ব।
। রে পা$\frac{১}{২}$ ঌমা$\frac{১}{২}$ পা পা। ধা নি ধা পা। ধা মা। মা$\frac{১}{২}$ পা$\frac{১}{২}$ ধা$\frac{১}{২}$ পা$\frac{১}{২}$। পা মা$\frac{১}{২}$ গা$\frac{১}{২}$ গা।
। প দে — ম তি। এ — — ভি। — ক্ষা। দে — — —। হি না থ।
। রেঃ ॥ ॥
। প ॥ ॥

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭, ভাদ্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	২১০।৵৯
পূর্ব্বকার স্থিত	৩৯৬৬৻৹
সমষ্টি	৪১৭৭৵৯
ব্যয় ...	১৮৩৬॥৴০
স্থিত ...	২৩৪০॥৴৯

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত ১৪৫৭৻৯
দফে উক্ত মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন একেকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ৫০০৲

	১৯৫৭৻৯
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত ...	৩৭৬॥৴০
	২৩৪০॥৴৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৫৩৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	১৪০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	১০৲
,, ,, ক্ষেত্রমোহনধর	২৲

এককালীন দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	১৲
	১৫৩৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...		১৩৻৴০
৺ বাবু জয়গোপাল সেন,	কলিকাতা	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল বসু,	ঐ	২৲
„ „ গোপালচন্দ্র দে,	ঐ	১৲
„ „ আশুতোষ চক্রবর্ত্তী	ঐ	১৲
„ „ বিনায়কচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	ঐ	৩৲
„ „ সুকুমার হালদার,	বৰ্দ্ধমান	২৶০
„ „ ভি, রায় স্কয়ার,	সন্দীপ	৩৵০
		১৩৻৴০
পুস্তকালয়		৮৻৶৯
যন্ত্রালয়		২৯৲
গচ্ছিত		৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৫॥০
সমষ্টি		২১০।৵৯

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৬৭০।৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৮॥৵০
পুস্তকালয় ...	২০।৩
যন্ত্রালয় ..	১১৭৶৬
গচ্ছিত	৵৬
সমষ্টি	১৮৩৬॥৴০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক শনিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ত্রিচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ ৩টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৭টার সময়ে ঈশ্বরোপাসনা হইবে। শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

ক্রোড়পত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য।

তাহার প্রথম উদ্দেশ্য এই যে—ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—ব্রাহ্মসমাজে যে ব্যাখ্যান প্রদত্ত হয় তাহা সাধারণের বিদিতার্থে প্রকাশ করা।

তৃতীয় উদ্দেশ্য—যে সকল গ্রন্থে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ আছে তাহা প্রকাশ করা।

চতুর্থ উদ্দেশ্য—ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ ও উপাসনা প্রণালী এবং সর্ব্বপ্রকার উপাসনার মধ্যে ব্রহ্মোপাসনাই যে শ্রেষ্ঠ তাহা বুঝাইবার জন্য আমাদের শাস্ত্রের সার মর্ম্ম সংগৃহীত করিয়া প্রকাশ করা।

পঞ্চম উদ্দেশ্য—বিচিত্র-শক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করা।

ষষ্ঠ উদ্দেশ্য—কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয়, "বিনীত ভাবে নম্রভাবে" এমত সকল উপদেশ প্রকাশ করা।

যাহাতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ও লেখকগণ সদ্ভাবে সাধুভাবে এই মঙ্গল উদ্দেশ্য গুলি প্রতিপালন করিয়া দেশের কল্যাণ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে যত্নবান থাকেন ও এই পত্রিকায় জ্ঞানী ও ধার্ম্মিকদিগের স্বীয় স্বীয় মনের ভাব প্রকাশ করিবার অনুকূল করিয়া দেন, তজ্জন্য ১৭৬৫ শকে তাঁহাদের প্রতি এই আমার প্রথম উপদেশ ছিল এবং যাহাতে তাঁহারা এই উদ্দেশ্য গুলি সদ্ভাবে সাধুভাবে প্রতিপালন করিয়া দেশের কল্যাণ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে যত্নবান থাকেন তজ্জন্য তাঁহাদের প্রতি এখনও এই ১৮১৮ শকে ইহাই আমার শেষ উপদেশ। এই উপদেশ অনুসারে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন করিলে ইহার পরমায়ু বৃদ্ধি পাইবে, অন্যথাচরণে ইহার মৃত্যুর আশঙ্কা।

শুভাভিলাষী

কলিকাতা।   শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দশ কল্প।
দ্বিতীয় ভাগ।
অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।

৬৪০ সংখ্যা ১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रय सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবের মুখে শ্রুত হাফেজের কয়েকটী শ্লোকের বাঙ্গলা অর্থ।

১। আমি এত যে বৃদ্ধ এবং এমন যে ভগ্নহৃদয় ও শক্তিহীন হ'য়ে পড়েছি কিন্তু যখনই আমি তোমার মুখচ্ছবি মনে করি তখনই আবার নব যৌবন প্রাপ্ত হই।

২। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ; যা' কিছু তাঁর কাছে চেয়েছি আমার সেই মিনতিতেই আমি লব্ধকাম হয়েছি।

৩। আমার কত অভাব ও কত প্রয়োজন তা' তুমি সকলই জান, আমি তোমাকে তা' আর কি জানাব? আমার মুখে কথা নাই; আমি আশ্চর্য্যে অবাক্ হয়েছি যে, আমার যে অভাব আমি আপনি জানি না, তা' ও তুমি পূরণ কর। তোমার করুণা, তোমার দয়ার তুলনা নাই।

৪। হে প্রাতঃসমীরণ, প্রিয়তমের নিকেতনে যাইতে শৈথিল্য করিও না এবং সেখান হইতে তাঁহার সংবাদ এ গরীব প্রেমিককে দিতে ক্ষান্ত থাকিও না।

৫। তুমি আমার হৃদয়ে একটী মাত্র শতদল পদ্ম, তাহা আমার মনের মত বিকশিত হইয়াছে, এখন আমাকে তার মধুদান করিতে ক্ষান্ত থাকিও না।

৬। তোমার একটী মাত্র কটাক্ষপাতই আমার সমুদায় প্রার্থনার শেষ। তোমার পুরাতন বন্ধুকে এইটুকু হ'তে বঞ্চিত ক'র না।

৭। তুমি যখন প্রতিপচ্চন্দ্র ছিলে তখন তোমার সঙ্গের আমি সঙ্গী ছিলাম, এখন তুমি যে পূর্ণচন্দ্র হয়েছ এখন যেন তোমার দৃষ্টি হ'তে আমাকে বঞ্চিত ক'র না।

৮। সংসার এবং সংসারে যা' কিছু আছে সকলই সহজ ও ক্ষুদ্র। তোমার অনন্যপরায়ণকে এই ক্ষুদ্রটুকু হ'তেও বঞ্চিত ক'র না।

৯। হে হাফেজ, বিরহ-যন্ত্রণার যে ধূলা উড়ে তোমাকে আচ্ছন্ন করেছে সে ধূলা পড়ে যাবে এবং তোমার মনের অবস্থাও ভাল হবে, কিন্তু তুমি সেই পথের ধূলার উপরে তোমার চক্ষের জল সিঞ্চন করতে ক্ষান্ত থেক' না।

১০। এই পৃথিবীর উদ্যানের ফল ফুলের যে এত সৌন্দর্য্য এ সব আমার কাছে কিছুই না, তোমার যে প্রসন্ন বদন তাই দেখ্‌লেই আমার পক্ষে বস্।

১১। রৌদ্রতাপে শ্রান্ত পথিক যেমন বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করে, তেমনি সংসারের শোকতাপে কাতর-হৃদয় আমার পক্ষে তোমার ছায়া পেলেই বস্।

১২। সেই সৌভাগ্যবান্ যে তাঁকে পায়। কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায় কার দ্বারা? যে তাঁকে পেয়েছে তারই দ্বারা। আমার যদি এমন একটী বন্ধু জোটে যে তাঁকে পেয়েছে তা' হ'লেই আমার পক্ষে বস্।

১৩। আমি যখন এমন বিশ্বাসী এবং প্রেমিক বন্ধু পেয়েছি তখন প্রাণ যাওয়া পর্য্যন্ত তাঁকে ত্যাগ করব না—তাঁকে চির-দিন হৃদয়ে রেখে দেব।

১৪। তোমার কৃপা আমার মন ও প্রাণে এত বদ্ধমূল হয়েছে, যদি মাথা চ'লে যায় তবুও আমার প্রাণ হ'তে তোমার কৃপা চ'লে যাবে না।

১৫। তোমার শরীরের সুগন্ধ আজ প্রাতঃকালে এই পুষ্পোদ্যানে এসে পৌঁচেছে। সেই সুগন্ধ পেয়ে মুকুলিত পুষ্প সকল আনন্দ-প্রবাহে আপনাদের কোমল বুক ছিঁড়ে ফেলেছে, যেমন প্রভাত আপনার তিমিরাবৃত রাত্রিবাস ছিঁড়ে ফেলে।

১৬। তুমি সেই সুখের প্রভাত আর আমি এই নির্জ্জন কুটীরের একটী মাত্র দীপ; সমস্ত রাত্রি অবসান হ'ল, এখন একবার সহাস্য মুখে চেয়ে দেখ, এই আমার প্রাণশিখাকে কেমন সহজে তোমাতে সমর্পণ করি।

১৭। প্রাতঃসমীরণ যে ভাগ্যবান্ * ধূলিকণাকে আমার বন্ধুর পথের পথিক করিয়া উড়াইয়া লইয়া যায়, সেই ধূলিই আমার নেত্রের মণিভস্ম কজ্জল।

১৮। প্রলয়ের বায়ু উঠিয়া যদি দ্যু-লোক ও ভূলোককে চূর্ণ করিয়া দেয় তথাপি আমি ও আমার চক্ষু উভয়েই সেই বন্ধুর পথের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

১৯। হে মধুময় প্রাণময় অমৃতময়, এই যে সব সুন্দর রঙ্গিন্ সুগন্ধযুক্ত এবং সুশ্রাব্য বস্তু রয়েছে এ যেন আমারই জন্য তৈরি হয়েছে।

২০। এক সময় তুমি আমার প্রাণের বন্ধু ছিলে, তখন সর্ব্বদাই তোমার সহিত থাকিতাম। এখন আর ততটা তোমাকে পাই না, সেই পূর্ব্বকার বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়াই দিন কাটাইতেছি, এখন আমার কথা আর কাহাকেও বলি না।

২১। হে মন, কি সহজে তুমি সেই প্রেমচক্ষুকে শিকার করেছ! এত সহজে কেহ বনের হরিণকেও শিকার করিতে পারে না।

২২। অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে পাইলেই সকল দুঃখ শোকের অবসান হয়।

২৩। এখানকার সব কাজ শেষ হ'য়ে গেছে। এখন ব'সে ব'সে আমি শুধু পৃথিবীর তামাসা দেখ্‌ছি।

২৪। সে বড় আনন্দের দিন যে দিন এই সংসার অরণ্য হইতে চলে যাব।

২৫। প্রাণের আরাম চা'ব ও আমার প্রাণপ্রিয়কে অনুসরণ করিব।

* দীন হীন ঈশ্বর প্রেমিক।

২৬। মৃদু প্রাতঃসমীরণের ন্যায় আমার ভগ্ন হৃদয় ও দুর্ব্বল শরীর লয়ে তাঁর জন্য পিপাসাতুর হ'য়ে ঐ সরল সুন্দর দোদুল্যমান দেবদারুর দিকে ছুটিব।

২৭। তাঁহার জন্য পিপাসাতুর হ'য়ে বিন্দুমাত্র যে আমি, আমি নাচিতে নাচিতে সেই দেদীপ্যমান সূর্য্য-সমুদ্রের তীরের দিকে ছুটিব।

—

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮১৮ শক। ৫ই কার্ত্তিক বুধবার।

নির্জ্জন বাস।

যাঁহারা স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান্ বা জ্ঞানবৃদ্ধ, দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারা সর্ব্বকালেই নির্জ্জনবাসের প্রতি অনুরক্ত। কেবল বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী বলিয়া নয়, যাঁহারা রাজাধিরাজ, ঐশ্বর্য্যশালী, ধনী হইয়াও বিদ্বান, এবং ভগবৎভক্ত, তাঁহারাও নিভৃত প্রয়াসী। এই সকল লোকের আত্মার টানই নিভৃতালয়ের দিকে, জ্যামিতির সৃষ্টিকর্ত্তা প্রসিদ্ধ য়ুক্লিডকে কোন এক রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, য়ুক্লিড, জ্যামিতি শিক্ষার তুমি একটা সহজ উপায় আমাকে বলিয়া দিতে পার? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, তাহা ত পারি না। জ্যামিতি শিক্ষার কোন রাজপথ নাই। অন্যান্য জিনিস বল দ্বারা আক্রমণ বা অর্থ দ্বারা ক্রয় করা যাইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানলাভ চিন্তা ভিন্ন হইতে পারে না। এবং সেই চিন্তা নির্জ্জনে অবস্থান ব্যতীত কিছুতেই হইবার নয়। সুতরাং জ্ঞানলাভার্থীর পক্ষে নির্জ্জন বাসই অনুকূল। জনকোলাহলপূর্ণ স্থানে অবস্থিতি করিলে কোন জ্ঞানই সুচারুরূপে লাভ করা যায় না। সর্ব্বদাই বাধা প্রাপ্ত হইতে হয়।

ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে সর্ব্বদাই লোক জনের সহিত মিশিতে হয়। সর্ব্বদাই লোক জন তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসে, অনেক সামাজিক বিষয়ে তাঁহাদিগকে হস্তক্ষেপ করিতে হয়, সর্ব্বদাই অর্থ ও বিষয় চিন্তা করিতে হয়, ইহাতে তাঁহাদের যথেষ্ট সময় নষ্ট ও চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। সুতরাং তাঁহারা বিষয় কার্য্যের দৌড়াদৌড়ি পরিহার পূর্ব্বক, মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনে যাইয়া নিশ্বাস ছাড়িতে বাধ্য হন।

ভগবৎভক্তের ত কথাই নাই, যেখানে থাকিলে অভদ্র দর্শন, অভদ্র শ্রবণ করিতে হয়, যেখানে পাপ প্রলোভন ইন্দ্রিয় সকলকে উত্তেজিত করে, যেখানে পরনিন্দাকারী ও পরপীড়ক সর্ব্বদাই নিরঙ্কুশ ভাবে কোমল হৃদয়ে ব্যথা দিতে তৎপর, এবং সতত ধার্ম্মিকের দ্বেষ করিয়া থাকে, যেখানে এক পাপী অপর এক পাপীকে সদর্পে পাপী বলিতে কুণ্ঠিত হয় না, যেখানে এক জন পাপ-সাগরে শয্যা পাতিয়া অন্যকে পাপ-শিশিরের ভয় প্রদর্শন করে, যেখানে নির্দ্দয় মনুষ্য এই প্রাকৃতিক যন্ত্রণার আলয় সংসারকে আরো অধিকতর দুঃখের স্থান করিয়া তুলে, সেখান হইতে তিনি দূরেই থাকিতে চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম এ বিষয়ে স্পষ্টাক্ষরে সাক্ষ্য দিতেছে। আমি সেই ঋষি-বাক্য এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা
বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোনুকূলে ন তু চক্ষুঃপীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রয়োজয়েৎ॥"

"কঙ্করশূন্য তপ্ত বালুকা বর্জ্জিত সমান

ও শুচি দেশ উত্তম জল, উত্তম শব্দ ও আশ্রয়াদি দ্বারা মনোরম স্থানে প্রতিবাদীর অনভিমুখে ও সুন্দর বায়ুসেবিত বিরল স্থানে স্থিতি করিয়া, পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিবে।”

কেবল উক্ত কয়েক প্রকার বিশেষ শ্রেণীর লোকেরই যে নির্জ্জনবাসের প্রয়োজন তাহা নহে। সকল শ্রেণীর লোকেরই ইহা প্রয়োজন। ইহার কারণ এই যে ঈশ্বরই কেবল শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, মনুষ্য মাত্রেই অল্প বা অধিক পরিমাণে পাপী, এই পাপ হইতে মুক্ত হইতেই হইবে, তাহা ভিন্ন জীবন যাতনাময়। জনকোলাহলময় স্থান প্রলোভনপূর্ণ। সেখানে পাপের আদর্শ ও কুসংসর্গের প্রাচুর্ভাব বিস্তর লক্ষিত হয়। সে স্থান অপেক্ষা নিভৃত নিলয়ে থাকিলে পাপ সহজেই দমন হয়। এই কারণে সকল লোকেরই অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে নিভৃতে বাস করা কর্ত্তব্য।

এই পাপের প্রকৃতি এক বার পর্য্যালোচনা কর, যে সকল ইন্দ্রিয় আমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে পাইয়াছি, তাহারা আমাদের জীবনপথে সহায়। তাহারা প্রথম হইতেই দাসের ন্যায় আমাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিয়াছে। প্রথম হইতেই আমরা তাহাদের সাহায্য ব্যতীত কিছুই করিতে পারি না। তাহাদের গতি বিদ্যুতবৎ, তাহাদের বিষয় খুঁজিয়া পাতিয়া আনিতে হয় না। এই সকল বিষয় আপনা হইতেই ইন্দ্রিয়গণের সম্মুখে বিন্যস্ত রহিয়াছে। সুতরাং মনুষ্য তাহাদের অত্যন্ত অধীন হইয়া পড়ে। এবং পরিশেষে তাহাদের শুভ ও অশুভ ফলপ্রদ সকল আদেশই প্রতিপালন করিতে বাধ্য হয়। কর্ত্তব্য-বুদ্ধি প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই এই সকল ব্যাপার ঘটে, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয়গণ প্রস্ফুটিত বা কার্য্যক্ষম হইবার বহু পরে কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়। মানুষ পাপের যন্ত্রণা অনুভব করিবার বহু পূর্ব্বে শারীরিক বেদনার ক্লেশ অনুভব করে। ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার পূর্ব্বেই আমোদ আহ্লাদ ও ইন্দ্রিয়সুখের পক্ষপাতী হয়। এইরূপে পাপ সর্ব্বপ্রথমেই আত্মারূপ দুর্গকে আশ্রয় করে। জন্মের পরেই প্রথম বয়সে কত লোক কুসংসর্গ ও মন্দ আদর্শের আকর্ষণের মধ্যে পড়ে। সে অবস্থায় দুর্ব্বল মনুষ্য আর কি করিতে পারে। অতএব পাপ মনুষ্যকে স্পর্শ করিবেই করিবে। কিন্তু কর্ত্তব্য-বুদ্ধি স্থির থাকিবার নয়। সময় উপস্থিত হইলে সে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আস্তে আস্তে উঠিতে থাকে। কে তাহাকে বাধা দিতে পারে? এই সময়েই দেবাসুরে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইহাই সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তির সংগ্রাম। এই সংগ্রামের বল কোন্ মনুষ্য না অল্প বা বহু পরিমাণে অনুভব করে? শারীরিক স্বাস্থ্য, অবস্থা, শিক্ষা, ও মনের অধিক বা অল্প শক্তি অনুসারে সকলেই ইহার বল অনুভব করিয়া থাকে। যিনি এই সময়ে সৌভাগ্য বশতঃ কর্ত্তব্যবুদ্ধির সহিত যোগ দিয়া পাপের সহিত প্রাণপণে সংগ্রাম করেন, তিনি নিজে দুর্ব্বল হইলেন তাহাতে কি? দুর্ব্বলের বল ঈশ্বর তাঁহার সহায় হন। কোথা নাথ! অনাথ-নাথ! বলিয়া কাতর প্রাণে যখন তিনি জীবনসহায়কে ডাকেন, তখন কি তিনি বধির হইয়া থাকিতে পারেন? কখনই নহে। ধর্ম্ম-জগতে অহরহ ইহার পরীক্ষা হইতেছে। যে তাঁহাকে ডাকে, ডাকবার মত ডাকে, ব্যাকুল হইয়া ডাকে, তাঁহার

পদতলে আসিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয়, তিনি তাহার হস্তে এমন ব্রহ্মাস্ত্র দেন, যে তাহার বলে, পাপের হস্তস্থিত অগ্নিবাণ শতধা হইয়া পড়ে। মনুষ্য যখন এই প্রকারে প্রার্থনার বলে বলীয়ান হয়, তখনই সে হৃদয়ে বল পায়। এ বল সামান্য নহে, এ দৈব বল। দৈব বল ভিন্ন কে কোথায় সমরজয়ী হইয়াছে? আবার সমরজয়ী হইলে তাহার আত্মা নব বল ও উৎসাহে উৎসাহান্বিত এবং তাহার চক্ষু নব জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হয়। সেই নবালোকের প্রভাবে সে পাপের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পায়। তখন আর পাপ মোহন কায়া ধরিয়া তাহাকে বিপথে লইয়া যাইতে পারে না। সুতরাং তাহার আর পুনঃ পুনঃ পতন হয় না। এই প্রকারেই মনুষ্য সংসারের উপর পাপের উপর জয়লাভ করিয়া থাকে। এই জয়লাভের জন্য নির্জ্জনতা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে। নির্জ্জনে যেমন তপস্যা হয়, ঈশ্বরে মনঃসমাধান হয়, সজনে তেমন কখনই হয় না। নির্জ্জনে মনুষ্য আপনাকে আপনি ভাল করিয়া বুঝিতে পারে ও নিজের দোষ দেখিতে পায়। অতএব যাহার যেমন সাধ্য, তিনি সেইরূপ নিভৃতে অবস্থান করিয়া আত্মচিন্তা ও আত্মানুসন্ধান করিয়া পাপ দমন করিবেন। এই জন্য সকলের পক্ষেই সৎ উদ্দেশে নির্জ্জনবাস শ্রেয়। আমি গৃহত্যাগী হইয়া অরণ্যবাসের কথা বলিতেছি না, নিভৃতে থাকিবার কথাই বলিতেছি।

গৃহী হইয়াই আমাদিগকে ধর্ম্মাচরণ ও ঈশ্বরসাধন করিতে হইবে। ইহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই। বাল্য যৌবনে সজনে থাকিয়াই বিদ্যা ও ধন উপার্জ্জন করিতে হইবে, পরিবার প্রতিপালন করিতে হইবে। ইহাতে আত্মার বিবিধ শিক্ষা ও ধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে আমাদের এমন সাবধান থাকিতে হইবে, যাহাতে সজনতার মধ্যেও নির্জ্জনতার সুবিধা ও সুখ অনুভব করিয়া জীবনের ফললাভ করিতে পারি। পরে ঈশ্বর যদি কৃপা করেন, তবে জীবনে এমন অবস্থা এমন সময় আসিতে পারে, যখন জনকোলাহলশূন্য নির্জ্জন স্থান ব্যতীত আর কিছুই ভাল লাগিবে না। এই অবস্থাই সমাধির পক্ষে অনুকূল। এই অবস্থায় একবার সুখ একবার দুঃখ, একবার আনন্দ একবার নিরানন্দ নাই। নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দের স্রোত আত্মায় বহিতে থাকে। গীতায় সে অবস্থার এইরূপ ব্যাখ্যা আছে,

"সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ" ॥

যে অবস্থায় যোগী ব্যক্তি এক নিরতিশয় অতীন্দ্রিয় বুদ্ধিগ্রাহ্য নিত্য সুখানুভব করেন, এবং যাহাতে স্থিত হইয়া তিনি আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হয়েন না।

হে দেব! কবে সে শুভ দিন উপস্থিত হইবে, যখন আমরা সকল পাপ সকল বাধা অতিক্রম করিয়া তোমাতে অবাতকম্পিত দীপশিখার ন্যায় অবস্থিতি করিতে পারিব। কৃপা করিয়া তুমি সেই দিন আমাদিগকে আনিয়া দাও। এই তোমার নিকটে প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

স্বাস্থ্যরক্ষা।

ইদানীং আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে সুস্থ ব্যক্তি অতীব বিরল। কেন এত বিরল, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য

গভীর গবেষণার প্রয়োজন নাই। সাধারণ লোকের কার্য্যকলাপ একটু মনোযোগ-সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলেই এবিষয়ের যথার্থ কারণ অবগত হওয়া যায়; এবং সাধারণের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণে হৃদয়ে যে ধারণা উদিত হয়, যাহারা জনসমাজে শিক্ষিত বলিয়া পরিগণিত, তাহাদিগের আচরণ সন্দর্শনে সেই ধারণা একটী দৃঢ় সংস্কারে পরিণত হইয়া উঠে। ফলত যিনি কিঞ্চিৎ প্রণিধান পূর্ব্বক সাধারণ লোকের আহার বিহার—তাহাদিগের অনিয়মিত সময়ে অপরিমিত ভোজন, অর্দ্ধ-চর্ব্বিতাবস্থায় খাদ্য গলাধঃকরণ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অনিয়মিত নিদ্রা, অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবন—দর্শন করেন, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী না জানাই যে এইরূপ অনিষ্টপ্রদ আচরণের মূল তদ্বিষয়ে কি তাঁহার কোন সংশয় হইতে পারে? হইলেও শিক্ষিত বলিয়া পরিগণিত লোকদিগের আচরণ-দর্শনে তাহা সর্ব্বথা নিরাকৃত হইয়া যায়। বাস্তবিক যাহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিগণিত তাহারা কাব্য দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় বিষয় সমূহে সম্যক পারদর্শী হইলেও শরীররক্ষা বিষয়ে একান্ত অজ্ঞ। এবিষয়ে তাহাদিগের আচরণ দর্শন করিলে হাস্য সম্বরণ করা যায়ই না, পরন্তু তাহাদিগের প্রতি একান্ত কৃপার আবির্ভাব হইয়া থাকে। যখন কোন গ্রন্থার্ণব-মগ্ন পণ্ডিত মূর্খকে ভোজনের সময়েও পুঁথির পাতা উল্টাইতে দেখা যায় কিম্বা রোগের সময়ে উচ্চ গণিত দর্শন প্রভৃতি দুরূহ বিষয়ের জটিল প্রশ্ন লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায় তখন কিরূপেই বা হাস্য সম্বরণ করা যায়, কিরূপেই বা কৃপান্বিত না হইয়া থাকা যায়? তখন শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তাহারা স্বতঃ নিজের নিজের যে কি ঘোর অনিষ্টের সূত্রপাত করিতেছে তাহা ভাবিয়া হৃদয় অবসন্ন হয় এবং লোকদিগের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্বাস্থ্যহানির মূলীভূত কারণ সম্বন্ধে আদৌ যে ধারণা হইয়াছিল তাহা সংশয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া একেবারে স্থির সিদ্ধান্তে পরিণত হয়।

কোন একটী বিষয়ের কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে পণ্ডিতগণ কেবল সেই বিষয়ের সন্নিকৃষ্ট কারণ বাহির করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, কিন্তু সোপানের পর সোপানান্তর অধিরোহণ করত তাঁহারা একেবারে আদিম মৌলিক কারণে পঁহুছিতে চেষ্টা করেন। এইরূপ না করিলে কোনও বিষয়ের তথ্য বাহির করা সুকঠিন হইয়া উঠে। সুতরাং কি ইতর কি শিক্ষিত সর্ব্বশ্রেণীর লোকই কেন স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে এত অজ্ঞ ইহারও কারণ ঐরূপেই অনুসন্ধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কিন্তু এস্থলে বলিয়া রাখা উচিৎ যে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম উল্লঙ্ঘনের কারণ যেমন সহজে নির্ণীত হইয়াছে এবিষয়ের কারণ-নির্দ্দেশ তেমন সহজে হইবে না। এজন্য বিশেষ প্রণিধান এবং ধৈর্য্য আবশ্যক। সুতরাং আমরা পাঠকবর্গকে এস্থান হইতেই বিশেষ মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি।

কেন লোকে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে এত অজ্ঞ? কোন বিষয়ে অনভিজ্ঞ হওয়ার দুই তিনটি কারণ আছে। প্রথমতঃ বিষয়টী সম্পূর্ণ অভিনব হইতে পারে। অভিনব বিষয়ে অনভিজ্ঞ হওয়া স্বাভাবিক। যেমন তড়িৎবিজ্ঞান। বিজ্ঞানের এই বিভাগটীতে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ইহার

কারণ এই যে তড়িৎশাস্ত্র আমাদের নিকট সম্পূর্ণ নূতন, এবিষয়ে আমাদের দেশে কখনও কোন রূপ আলোচনা হয় নাই, তড়িৎ বিষয়ক জ্ঞান যে মনুষ্যের আয়ত্তাধীন তাহা আমাদের আদবেই বিশ্বাস ছিল না। স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়েও কি তাহাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কি স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়ে কোন আলোচনা বা তত্ত্বনিরূপণ করিয়া যান নাই? তাহাও স্বপ্নেও বিশ্বাস হইবে না। আমাদের দেশীয় প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদোক্ত গ্রন্থ সমূহে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে যেরূপ সুন্দর উপদেশাবলী রহিয়াছে তাহা দেখিয়া কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তির বিশ্বাস হইবে যে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ উদাসীন ছিলেন?

অজ্ঞতার দ্বিতীয় কারণ বিষয়টীকে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া উপেক্ষা করা। বুদ্ধিজীবি প্রাণীমাত্রেরই স্বভাব এই যে যাহা তাহার নিকট অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহা উপেক্ষা করিয়া সে কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ান্তরে লিপ্ত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ব্রহ্মবিদ্যাই পরা বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, এই জন্য আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ তত্ত্ববিদ্যারই সমধিক আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে পদার্থ বিদ্যার তত আদর ছিল না এবং তজ্জন্য তাঁহারা পদার্থ বিদ্যার বড় বিশেষ আলোচনাও করেন নাই। এবং করেন নাই বলিয়াই আজ আমরা যুনানী জাতিদিগের বহু পশ্চাতে থাকিয়া তাহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিতেছি। স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও কি তাহাই। স্বাস্থ্য কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট অপ্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের মধ্যে পরিগণিত ছিল? তাহা হইলে তদ্রচিত গ্রন্থ সমূহে "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" প্রভৃতি সারবান্ বচনাবলী পাওয়া যাইত না। অতএব তাঁহাদিগের নিকট স্বাস্থ্য বিজ্ঞান কদাপি অপ্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য ছিল না।

তাঁহাদিগের নিকট ছিল না বটে; কিন্তু কালবশে এবং শিক্ষাদোষে আমাদিগের নিকট হইয়াছে। অতি অল্প বিষয়ই প্রাচীন আর্য্যদিগের নিকট স্বাস্থ্য অপেক্ষা অধিকতর আদরণীয় বলিয়া পরিগণিত ছিল। পারৎপক্ষে তাঁহারা কখনও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী উল্লঙ্ঘন করিয়া ইষ্টলাভের চেষ্টা করিতেন না। স্বাস্থ্যই যে ত্রিবর্গলাভের প্রধান সহায় তাহা তাঁহারা বিশেষরূপে জানিতেন এবং সর্ব্বদাই সর্ব্বপ্রযত্নে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতেন। এই জন্যই আমাদিগের অপেক্ষা তাঁহারা বলবুদ্ধিতে অত বড় ছিলেন। কিন্তু "তে হি নো দিবসা গতাঃ।" শিক্ষার দোষে আজ অতি নগণ্য বিষয় সকলও আমাদিগের নিকট স্বাস্থ্য অপেক্ষা গরীয়ান্ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।

অধিকন্তু স্বাস্থ্য সাধন একটা অতি প্রতিকূল অবস্থা বলিয়া অনেকের ধারণা হইয়া উঠিতেছে। স্ত্রীলোকদিগের পর্য্যন্ত বিশ্বাস হইয়াছে যে কোনও বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে হইলে শরীরের প্রতি— আহারের প্রতি দৃষ্টি রাখা অনুচিৎ। ফলে এই হইতেছে যে অতি সামান্য কারণেই আমরা স্বাস্থ্য উল্লঙ্ঘন করিতেছি।

আমরা যে অতি সামান্য কারণেই স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকি, আমাদিগের অশন বসন শয়ন গমনের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিলেই ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

এক অশন বিষয়েই আমরা যে কত স্বাস্থ্যের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকি তাহা

ভাবিলে হৃদয় দুঃখে অবসন্ন হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ ক্ষীর মৎস্য প্রভৃতি বিরুদ্ধভোজন অর্থাৎ ক্ষীরের সহিত মৎস্যাহার করা আমাদিগের নিত্যনৈমিত্তিক হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ অপরিমিত ভোজনে আমাদের পরম প্রীতি হয়। তৃতীয়তঃ খাদ্য অৰ্দ্ধ চর্ব্বিতাবস্থায় গলাধঃকৃত করিয়া তাড়াতাড়ি ভোজন শেষ করা আমাদের মধ্যে ভোজনপটুতা বলিয়া পরিগণিত। চতুর্থতঃ আমরা খাদ্যকে সুস্বাদ করাই রন্ধনের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি। এইরূপ আর কত বলিব। সব বলিতে গেলে একখানা পুঁথি হইয়া পড়ে।

আহার বিষয়ে আমরা যেরূপ নিয়মোল্লঙ্ঘন করিয়া থাকি গমন শয়নাদি বিষয়ে আমরা তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করি না। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে, কিরূপে শরীর সুস্থ রাখিয়া গমন করিতে পারি তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না, কিন্তু কি প্রকারে দ্রুত যাইতে পারিব তজ্জন্যই আমরা সর্ব্বাগ্রে ব্যাকুল হইয়া উঠি। আমরা দ্রুত যাওয়ার নিমিত্ত ঘাটে পথে রেলওয়ে ট্রামওয়ে প্রস্তুত করিতেছি বটে কিন্তু ইহাতে স্বাস্থ্যের হানি হইতেছে কি না তাহা আদরেই বিচার করিয়া দেখি না। শয়ন সম্বন্ধেও তথৈবচ। আমাদিগের মধ্যে শয়নোত্থানের যে রীতি আছে তাহা নিতান্ত গর্হিত। সকলেই অবসর থাকিলে দিবা নিদ্রা গিয়া থাকেন। পরিবারের মধ্যে কি যুবা কি বৃদ্ধ কি বালক সকলেরই এক সময়ে গাত্রোত্থান করিতে হয়। সবল ও দুর্ব্বল ভেদে যে নিদ্রার সময় বেশি কম হওয়া উচিৎ আমাদের সে বিবেচনা নাই। এক শয্যার মধ্যে ৬।৭ জন পর্য্যন্ত রাত্রি যাপন করিয়া থাকি।

অধিক কি যে পরিচ্ছদ আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট অতীব নগণ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল তাহাও আজ আমাদিগের নিকট স্বাস্থ্যাপেক্ষা গরীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ পরিচ্ছদের বিষয় ভাবিয়া দেখিলে আমরা যে এ বিষয়ে সর্ব্বাংশে পৃথিবীর বর্ব্বর জাতিদিগের তুল্য তাহাতে আর সন্দেহের লেশও থাকে না। যেরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্যরক্ষার সুবিধা হয় তাহা দেখিতে সুন্দর না হইলে আমরা তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকি। এবং ভদ্রতার অনুরোধে সভ্যতার খাতিরে যেরূপ পরিচ্ছদে সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বাস্থ্যহানি হয়, তাহারই আদর বাড়াইতেছি।

এইরূপ কত ভাবে যে আমরা স্বাস্থ্যহানি করিতেছি তাহার পরিসীমা নাই। অহো আমরা কি দুর্ম্মতিগ্রস্তই হইয়াছি। বিষয়-মৃগতৃষ্ণিকায় ভুলিয়া অমৃতের সাগর ফেলিয়া সুখের আশায় শুষ্কপদার্থ সংগ্রহে ব্যস্ত রহিয়াছি। রত্নের প্রকৃত আকর ছাড়িয়া অন্তঃসারবিহীন বাহ্য চাকচিক্যেরই আদর করিতে শিখিয়াছি। স্বাস্থ্য যে প্রত্যক্ষ অমৃত, আরোগ্য যে সুখের মূল, সাধনার ভিত্তি, উন্নতির সোপান, ত্রিবর্গ লাভের অবধারিত পন্থা তাহা ভুলিয়া গিয়া, সকলেই অজ্ঞাতসারে কেহ বা ধীরে ধীরে কেহ বা প্রবল বেগে বিনাশের দিকে অগ্রসর হইতেছি। কিন্তু স্বাস্থ্য কি বাস্তবিকই উপেক্ষণীয়? স্বাস্থ্য যদি সত্য সত্যই অকিঞ্চিৎকর হয় তবে জীবন প্রার্থনীয় কিসে? অসুস্থ চিররোগাভিভূত শরীর ধারণে সুখ কি? অসার যন্ত্রণাময় দেহের দ্বারা কোন্ কার্য্যই বা সাধন করা যায়? অতএব যাহাতে শরীর অকালে অকর্ম্মণ্য না হইয়া পড়ে, যাহাতে শারী-

রিক নিয়ম উল্লঙ্ঘিত না হয়, যাহাতে শরীর চিরসবল থাকে তৎপ্রতি মনুষ্যমাত্রেরই দৃষ্টিরাখা কর্ত্তব্য।

মিত্রতা।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়াকে করুণা বলে। করুণা সাধন করিতে পারিলে আমাদিগের মনের দ্বেষভাব নষ্ট হয়। কেহ উত্তম কর্ম্ম করিয়াছেন তাহাতে হৃষ্ট হইয়া সেই লোককে প্রশংসাদি করিয়া শুভকর্ম্মে উৎসাহ দান করাকে মুদিতা সাধন বলে। এই মুদিতা সাধন করিতে শিখিলে মনের অসূয়া-দোষ নষ্ট হইয়া যায়। পরের পাপ বা দোষ দেখিয়া অথবা কেহ অনর্থক নিন্দা করিতেছে শুনিয়াও তাহাকে দ্বেষ বা ঘৃণা না করিয়া সর্ব্বতোভাবে উদাসীন থাকাকে উপেক্ষা বলে। উপেক্ষা সাধন দ্বারা মনের অমর্ষ-দোষ নষ্ট হয়। এখন বিচার করা কর্ত্তব্য, যে জীব মাত্রের প্রতি মৈত্রীভাব অবলম্বন করিতে না পারিলে যোগী কখনই করুণা মুদিতা ও উপেক্ষা সাধনে সমর্থ হইতে পারেন না, কারণ যদি আমাদিগের মনে ক্রোধ, শক্রতা, ও হিংসা ভাব বিরাজিত থাকে তবে আমরা কি প্রকারে পরের দুঃখে দুঃখিত হইতে পারিব। অপরের প্রতি যদি আমাদের ভালবাসাই না থাকিবে তবে কি প্রকারে অপরে ভাল কর্ম্ম করিলে তাহার প্রতি ঈর্ষা না হইয়া তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হইবে, ও কিরূপেই বা আমরা মনের সহিত তাহাকে সৎ কর্ম্মে উৎসাহ দিতে সমর্থ হইব। এইরূপে উপেক্ষার বিষয় ও বুঝিতে হইবে। বলিতে কি সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ও উদারপ্রকৃতি ব্যতীত কেহই যথার্থ মিত্রতা সাধনে সমর্থ হয়েন না। শত্রু এবং মিত্র কেবল কথায় হয় না। কার্য্যেই শত্রু ও মিত্রের পরীক্ষা হইয়া থাকে। নীতি শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ।
ব্যবহারেণ জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা ॥
আপৎস্থ মিত্রং জানীয়াৎ যুদ্ধে শূরমৃণে শুচিং।
ভার্য্যাং ক্ষীণেষু বিত্তেষু ব্যসনেষু চ বান্ধবান্ ॥
উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ ॥"

অর্থাৎ তাবৎ কেহ কাহারও মিত্র বা কেহ কাহারও শত্রু নহে যাবৎ ব্যবহার দ্বারা মিত্র কিম্বা রিপু জানা না যায়।

আপদ কালে সুমিত্র, যুদ্ধে শূর, ঋণে শুচি, দরিদ্রাবস্থায় স্ত্রী ও ব্যসন কালে বন্ধুর পরীক্ষা হইয়া থাকে।

যিনি উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, দেশোপদ্রবে, রাজদ্বারে ও শ্মশানে সহায়তা করেন তিনিই প্রকৃত বন্ধু।

এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে মিত্রতা রক্ষা করা সামান্য কথা নহে। প্রথমতঃ লোকের সুখ ও দুঃখে একান্ত সুখী বা দুঃখিত হইতে না পারিলে কেহই যথার্থ মিত্রতা স্থাপনে সমর্থ হন না। তৎপরে প্রকৃত মিত্র হইবার জন্য ইন্দ্রিয়জয়ী হওয়া কর্ত্তব্য। এমন কি মিত্রতা সাধন করাই ধর্ম্মসাধনের এক প্রধান অঙ্গ ও উপায়। ধর্ম্ম শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"নাশ্রমঃ কারণং ধর্ম্মে ক্রিয়মাণোভবেদ্ধি সঃ।
অতোযদাত্মনোঽপথ্যং পরস্য ন তদাচরেৎ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

দূষিতোঽপি চরেদ্ধর্ম্মং যত্রতত্রাশ্রমে রতঃ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণং ॥"

মনুসংহিতা।

কোন বিশেষ আশ্রম অবলম্বন করা ধর্ম্মের প্রতি কারণ হইতে পারে না। কেন না মনুষ্য ইচ্ছা করিলেই আশ্রমের বাহ্য চিহ্ন অবলম্বন করিতে পারেন। এই

জন্য আপনার যাহা অপথ্য তাহা পরের প্রতি আচরণ করা কর্ত্তব্য নহে অর্থাৎ অপরে যে ব্যবহার করিলে নিজের ক্ষোভ জন্মাইতে পারে এরূপ ব্যবহার অন্যের প্রতি করা উচিত নহে।

লোকে যে কোন আশ্রমস্থিত হইয়া থাকুন না কেন, অথবা তত্তৎ আশ্রম ধর্ম্মাদির বাহ্য লক্ষণ ভ্রষ্ট হউন না কেন, যদি তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী হন, তবে বর্ণাশ্রমত্যাগাদির জন্য তাঁহার ধর্ম্মে অনধিকারিত্ব আশ্রয় করিতে হয় না। যে হেতু বর্ণাশ্রমাদির বাহ্য চিহ্ন ধারণ ধর্ম্মের প্রতি কারণ নহে।

এখন দেখুন যদি আমরা সর্ব্বজীবে মৈত্রীভাব অবলম্বন না করি তবে কখনই আমরা নিজের অপথ্যের ন্যায় পরের অপথ্য বিবেচনা করিতে পারি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সর্ব্বভূতে সমভাব অবলম্বন করাকেই মৈত্রী সাধন বলে। এই মৈত্রীযুক্ত পুরুষই শাস্ত্রে পণ্ডিত সংজ্ঞার বাচ্য হয়েন। যথা—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ গীতা।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥
চানক্যনীতি ইত্যাদি।

অর্থাৎ বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, গো হস্তী কুক্কুর এবং চণ্ডালাদির প্রতি যিনি সমদর্শী তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। যে ব্যক্তি সর্ব্ব ভূতকে আপনার ন্যায় দর্শন করেন তিনিই পণ্ডিত ইত্যাদি। বেদ শাস্ত্রেও সমভাব অবলম্বন করিবার আদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋগ্বেদে লিখিত আছে

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥"
সমানোমন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়েবঃ সমানে নবো হবিষা জুহোমি।
ইত্যাদি

বেদশাস্ত্র উপদেশ দিতেছেন যে হে মনুষ্যগণ, তোমরা পক্ষপাত-রহিত হইয়া ন্যায় ধর্ম্ম ও সত্যাচরণকে গ্রহণ কর। বিরোধ ত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর সম্মতিযুক্ত হও। তোমরা বাদ বিতণ্ডা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংবাদ কর অর্থাৎ সত্য বিদ্যার পঠন পাঠন কর। তোমরা আপন আপন জ্ঞান নিত্য বৃদ্ধি কর। তোমাদিগের মন প্রকাশযুক্ত হইয়া নিত্য আনন্দে মগ্ন থাক্। যেরূপ ধর্ম্মাত্মা বিদ্বান দেবতাগণ সত্য ধর্ম্মের আচরণ করেন, তদ্রূপ তোমরাও কর। হে মনুষ্যগণ, তোমাদিগের মন্ত্র অর্থাৎ সত্যাসত্যের বিচার সমান অর্থাৎ বিরোধ-রহিত হউক। তোমাদিগের সমিতি সমান অর্থাৎ বিরোধ-রহিত হউক, অর্থাৎ তোমরা পরস্পরের সাহায্যে সর্ব্বদা রত থাক। তোমাদিগের মন সমান অর্থাৎ সমভাবাবলম্বী হউক অর্থাৎ জীব মাত্রের প্রতি তোমাদের সমদৃষ্টি হউক। তোমাদিগের মন ও চিত্ত মনুষ্যের সুখের জন্য চেষ্টিত হউক। যে মনুষ্য জীবমাত্রের উপকারে রত হন তাঁহাকে পরমাত্মা অনুগ্রহ করেন। তোমরা পদার্থগ্রহণ ও দান কালে অসত্য ব্যবহার ত্যাগ করিবে।

জগতে যতই কেন কেহ মহান্ বলবান হউন না, যদি তিনি ইন্দ্রিয়জয়ী হইয়া সমভাবাবলম্বী না হন, তবে তিনি কখনই প্রকৃত মৈত্রী ভাব অবলম্বন করিতে সমর্থ হন না। জগতের ইতিহাস ও পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে মহা মহা পরাক্রমী শূর,বীর,অসুর ও দৈত্যগণ সামান্য ইন্দ্রিয়াভিলাষ সাধন জন্য পরস্পরের মিত্রতা ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। শান্তচিত্ত উদার-প্রকৃতি ব্যক্তি ভিন্ন কেহই সমভাব সাধন

করিতে সমর্থ নহেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে।—

"অয়ং নিজঃ পরোবেত্তি গণনা লঘুচেতসাং
উদারচরিতানান্ত বসুধৈব কুটুম্বকং॥

অর্থাৎ ইনি আত্মীয় ইনি অপর, এরূপ গণনা ক্ষুদ্রান্তঃকরণযুক্ত মনুষ্যগণই করিয়া থাকেন, সচ্চরিত্র ও উদারচিত্ত লোক-দিগের পৃথিবীর সকল ব্যক্তিই আত্মীয় হয়েন।

ক্রমশঃ।

প্রার্থনা। (১)

প্রাতে—নিদ্রা-ভঙ্গে।

কে তুমি সারাটী রাত রক্ষিলে আমায়।
যখন মগন ছিনু গভীর নিদ্রায়॥
মাতা অবনত মুখে স্নেহ-আঁখি-ভরে,
চাহিয়া থাকেন যথা সন্তান উপরে,
তার চেয়ে কত স্নেহে তুমি গো জননি!
চাহিছ আমার পানে দিবস রজনী॥
দিতেছ কতই সুখ স্নেহেতে ভরিয়া।
দুঃখেতেও তব স্নেহ দেখি নিরখিয়া॥
দুঃখে তুমি বলিতেছ সান্ত্বনা বচন।
দেখা দিয়া করিতেছ দুঃখ নিবারণ॥
মাতৃগর্ভে অসহায় আছিলাম যবে।
তুমিই আমারে রক্ষা করিলে গো তবে॥
জন্মিবার আগে তুমি আমার আহার—
মাতার স্তনেতে দুগ্ধ—করিলে সঞ্চার॥
মাতার হৃদয়ে স্নেহ আমা তরে দিলে।
সেই স্নেহ উপলক্ষে আমারে রক্ষিলে॥
পিতার মাতার স্নেহ করিয়া প্রেরণ।
তুমিই পালিলে মোরে করিয়া যতন॥
কত যে তোমার স্নেহ অধম এজনে।
ভাবিয়া না পাই তাহা—না যায় কথনে॥
এইক্ষণে তব দয়া করিছ বর্ষণ।
আমার জীবনে প্রাণ করিছ সিঞ্চন॥
তাই তোমা হ'তে আজ পাইতেছি প্রাণ।
তুমি প্রাণ-দাতা—প্রাণ করিতেছ দান॥
অসীম জগতে জীব কতই প্রকার।
তুমি পিতা মাতা বন্ধু হও সবাকার॥
সবাকারে তুমি স্নেহে করিছ পালন।
সবার অভাব তুমি করিছ মোচন॥
কিন্তু তব এত স্নেহ অধীন এজনে,
হেন মনে লয়—এই অনন্ত ভুবনে,
নাহি আর কেহ তব স্নেহ করিবার।
আমা প্রতি বরষিছ হেন স্নেহ-ধার॥
স্নেহের মুরতি তব দেখি অভিরাম।
সুপ্রভাত করি আজ লয়ে তব নাম॥
আজ যেন রাখি তোমা নয়নে নয়নে।
তোমার আদেশ ধরি হৃদয়ে যতনে॥
বল আজ কিবা কায করিব তোমার।
তোমার যে কায তাহা হউক আমার।
আজ নাহি পড়ি যেন মোহের ছলনে।
তব শুভ কায যেন করি প্রাণপণে॥

বোধ-গয়া।

লোকে সচরাচর যাহাকে বুদ্ধ-গয়া বলে, তাহার প্রকৃত নাম বোধ-গয়া, অর্থাৎ রাজকুমার শাক্যসিংহ এই পবিত্র স্থানে পুণ্যসলিলা নিরঞ্জন নদীতটে এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে ধ্যানাবলম্বন পূর্ব্বক বুদ্ধত্ব লাভ করেন। সেই অবধি ঐ স্থানের নাম হইল (বুদ্ধ-গয়া বা বোধ-গয়া। সর্ব্বসাধারণেও উহাকে বোধ-গয়া বলে। আর যে চিরস্মরণীয় বৃক্ষতলে ঐ মহাপুরুষ সিদ্ধি লাভ করেন, তাহার নাম 'বোধি-বৃক্ষ' বা 'বোধি-দ্রুম' বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হয়। সে বৃক্ষ আর নাই; তবে উহার কতকটা কাষ্ঠ কলি-

কাতাস্থ চিত্রশালিকায় সংরক্ষিত হইয়াছে।

বোধ-গয়া হিন্দুতীর্থ গয়াধাম হইতে প্রায় তিন ক্রোশ ব্যবধান। যাইবার রাস্তা পাকা। তথায় এক্কা, গরুর গাড়ী ও ঘোড়ার গাড়ী সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। অর্দ্ধ পথে সেনানী গ্রাম। ইহার আধুনিক নাম কির্যামা। এরূপ কথিত আছে যে বুদ্ধদেব বোধ-গয়া গমনকালীন এইস্থানে সুজাতা নাম্নী এক স্ত্রীলোকের নিকট পায়স গ্রহণ করেন; এবং সত্য নামে এক ব্রাহ্মণের নিকট আট মুষ্টি কুশ লইয়া বোধি-দ্রুমতলে রোপণ করত সাত দিন ধ্যানে মগ্ন থাকেন। মহাবোধি মন্দিরের অদূরবর্ত্তী নিরঞ্জন ও মহানদীর মধ্যবর্ত্তী মলতঙ্গা নামে আর এক স্থান আছে। বুদ্ধদেব এইস্থানে দুগ্ধ পান করেন। কিন্তু একথা পালিগ্রন্থে নাই; কোনও সিংহলবাসী ভিক্ষুও বিশ্বাস করেন না। সে যাহা হউক আমরা দুই পার্শ্বে প্রশস্ত শস্যক্ষেত্র, সুশীতল নির্ম্মল জলপূর্ণ কূপ অতিথিশালা ও বিশ্রামাগার এবং শৈবপ্রধান স্থানের নিদর্শন যথা মাঝে মাঝে শিবমন্দির ও তুলসীমঞ্চ সদৃশ এক একটি ইষ্টকনির্ম্মিত উপাসনার স্থান দেখিতে দেখিতে বোধ-গয়া ধামে উপস্থিত হইলাম। সরলহৃদয় একজন ভিক্ষু আমাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন। তথায় যাট বৎসরের অধিক বয়স্ক আর একটী ভিক্ষু আছেন। ইনি পদব্রজে সাত মাসে সিংহল হইতে কলিকাতায় আগমন করেন, এবং কলিকাতা হইতে বোধ-গয়ায়ও ঐরূপে গমন করিতেন, কিন্তু কোনও প্রসিদ্ধ বৌদ্ধের নিষেধ নিবন্ধন করেন নাই। ঐ স্থানে নির্ব্বাণ লাভ করিবার ইঁহার একান্ত বাসনা।

মন্দিরের এক কোণে সাধুদিগের থাকিবার স্থান। ইহা ব্রহ্মদেশের ভূতপূর্ব্ব রাজা থিবোর পিতার দ্বারা নির্ম্মিত হয়। একতল গৃহ, তিনটি কামরা পাশাপাশি আছে। দক্ষিণ কামরায় ধর্ম্মানুরাগী ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক জাপান সাম্রাজ্য হইতে আনীত চন্দন কাষ্ঠের অতি সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে। মঠধারী ভিক্ষুগণ উহাঁর পূজা করিয়া থাকেন। বঙ্গেশ্বর সর এলেকজাণ্ডার ম্যাকেনজি উহাঁকে ঐস্থানেই রাখিতে আদেশ করিয়াছেন। মধ্যস্থলের কুঠরিতে সাধুদিগের আহার্য্য দ্রব্যাদি এবং উত্তরের ঘরে তাঁহাদিগের পুস্তকাদি থাকে।

বলা বাহুল্য বৌদ্ধ রাজা অশোক এই জগদ্বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সুতরাং ইহা যে কত দিনের পুরাতন তাহা পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন। প্রাচীন সময়ে ইহা কিরূপ ছিল, তাহা এখানে বলিতেছি না। তবে যাহা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহারই বিষয় লিখিতেছি। মন্দিরটি গড়খাৎ ভূমির মধ্যস্থলে অবস্থিত সমাধি সমূহে (যাহাকে চৈৎ বা স্তূপ বলে) পরিবেষ্টিত। তোরণ পশ্চিমাভিমুখে। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে বোধি-বৃক্ষের বংশধর যেন জন্ম জরা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মপিপাসুদিগকে আহ্বান করিয়া সুশীতল ছায়া দানে মন, প্রাণ ও আত্মার তৃপ্তি ও কল্যাণ সাধন করিতেছে। বৌদ্ধ যাত্রীরা ইহার পত্র ফল ও বীজ অতি যত্ন পূর্ব্বক লইয়া যান। এক জন সিংহলনিবাসী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ইংরাজী অক্ষরে পালি ভাষায় লিখিত

বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় বচন কতকগুলি প্রস্তর-ফলকে খোদিত করিয়া এইস্থানে রাখিয়াছেন। কথিত আছে অশোক রাজা বুদ্ধের বোধি-বৃক্ষতলের আসন হীরক মণি মাণিক্যাদিতে খচিত করাইয়া দেন। কিন্তু লুণ্ঠনকারীদিগের হস্ত হইতে তৎসমুদয়ও রক্ষা পায় নাই। এখন কেবল চূণ সুরকিতে গাঁথা একটি আসনের কঙ্কাল মাত্র আছে।

মন্দিরটির কথা কি বলিব? ইহা অতুচ্চ নহে; কিন্তু ইহার সৌন্দর্য্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ও স্থপতিগণ করিয়াছেন। সৌন্দর্য্য কিসে? গঠনে ও প্রাচীনত্বে। ইষ্টক ও প্রস্তর ইহার উপাদান; কাষ্ঠের নাম নাই; সমস্ত খিলান। ইট এক এক খানি বড় বড় মোটা মোটা টাইল-সদৃশ। এক এক প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড সোপান নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। শত শত বৎসর উহার উপর অধিরোহণ ও অবরোহণের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে তথাপি উহাকে মসৃণ করিতে পারে নাই। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সর আশ্‌লি ইডন যখন বঙ্গের শাসনকর্ত্তা তখন জেনরেল সর কনিংহ্যামের তত্ত্বাবধানে ও সুবিখ্যাত স্থপতি বেগলার সাহেবের দ্বারা মন্দিরের জীর্ণসংস্কার হয়। সেই সময়ে উহার এক লৌহময় দ্বার নির্ম্মিত হয় নচেৎ পূর্ব্বে দ্বার ছিল না, যদি থাকে তাহার কোনও চিহ্ন নাই। প্রবেশ করিয়াই স্থানের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি সম্বন্ধে অন্তরে এক অনির্ব্বচনীয় ভাব জাগরূক হইল। মস্তকোপরি এক চন্দ্রাতপশোভিত বৃহৎ খিলান; সম্মুখে অশোক প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরনির্ম্মিত কিন্তু সম্প্রতি সোণালী রঙ্গে রঞ্জিত বুদ্ধমূর্ত্তি। এক খণ্ড গোলাপী বর্ণের রেশমী বস্ত্রে গাত্র আবৃত থাকাতে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে কি না বলিতে পারি না, তবে বোধ হয় আধুনিক সভ্যতার অধিকমাত্রার লজ্জাশীলতা ও সুরুচি সংরক্ষণার্থে উহা করা হইয়াছে। সৌম্যমূর্ত্তি যোগাসনে আসীন; সম্মুখে কিছু ফুল পড়িয়া আছে, তাহাতে বোধ হইল পূজা হইয়া থাকে। দক্ষিণে ও বামে উপরে যাইবার সিঁড়ি, উপরে যাইলাম। উপরে মন্দিরের চারি কোণে চারিটি ক্ষুদ্র মন্দির। দুইটিতে দুইটি বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। মধ্যস্থলে এক অতি উত্তম ভজনার স্থান শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। এইখানে ধর্ম্মপাল 'জাপান-মূর্ত্তি' রাখিয়াছিলেন। ইহার এক প্রকোষ্ঠে সিদ্ধার্থের এক মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। মন্দির যত শূন্যে উঠিতেছে তত ক্রমশঃ সরু হইয়া চূড়া কতকটা পদ্ম বা ছত্রাকার ধারণ পূর্ব্বক পরিসমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীক্ষেত্রের ও বোধগয়ার মন্দির প্রায় একপ্রকার। শুধু তাহা নহে। আমরা গয়া অঞ্চলে অনেক এমন কি প্রায় সমস্ত দেবমন্দির এই আদর্শে গঠিত হইয়াছে দেখিলাম। মহাবোধি মন্দিরের সম্মুখে ব্রহ্মরাজপ্রদত্ত দুই বৃহৎ ঘণ্টা বড় বড় মোটা কাষ্ঠদণ্ডে টাঙ্গান আছে। তাহাদের পার্শ্বে তিব্বতীয় ভজনাচক্র (Prayer wheel) তুল্য একটি রচনা-চাতুরী দেখিলাম। মন্দিরের সম্মুখে চার পাঁচটি ছোট ছোট মন্দির আছে। এরূপ অনুমিত হয় যে, সে গুলিতে পূর্ব্বে প্রস্তরনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল, এখনও দুই একটিতে ঐরূপ মূর্ত্তি আছে; কিন্তু তৎসমুদয় হিন্দুর দেবতা শিবের কোনও কোনও নামে অর্চ্চিত হইতেছে। মন্দিরের সীমার বহির্ভাগে অনতিদূরে একটি পুরাতন কূপের ধারে শাক্য-মাতা মায়া দেবী

দণ্ডায়মানা আছেন। ইহা সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ প্রস্তর-মূর্ত্তি। দুঃখের বিষয় নাসিকা প্রভৃতি দুই একটি অঙ্গহীন। ইহার সন্নিকটে একটি পুরাতন পতনশীল দ্বিতল সাধুদিগের আশ্রম আছে, ইহাতে এখন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা এবং রাম সীতা ও লক্ষ্মণের মূর্ত্তি পূজা হইতেছে; এই দেবালয়ের সংশ্লিষ্ট ভূমির উপসত্ব দেবসেবায় ব্যয়িত হয়। যে সাধুর উপরে পূজার ভার ন্যস্ত আছে, তিনি কেবল মহান্তের নিকট হইতে সিধা পাইয়া থাকেন। কএক পদ গমন করিলেই মহান্তদিগের সমাধিক্ষেত্র। আমার বিবেচনায় এগুলি যে বৌদ্ধ সমাধি (চৈয়ৎ বা স্তূপ) ছিল তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে মহান্ত-সমাধিতে—কাহারও কাহারও দেহ, কাহারও কাহারও বা জটা ও খড়ম সমাহিত।

মহাবোধি-মন্দিরের দক্ষিণে 'বুদ্ধকুণ্ড' নামে বৃহৎ প্রাচীন শান-বাঁধান অতি উত্তম ও পুরাতন পুষ্করিণী। স্নানান্তে এক জন মানুষ বসিয়া পূজা ধ্যান করিতে পারে এমন কতকগুলি ছোট ছোট ঘরের মত উপাসনার স্থান তাহার ধারে আছে। রাজা অশোক ঐ পুষ্করিণী খনন করাইয়া যান। ইহা এখনও বেশ গভীর। অনেক বড় বড় মৎস্য আছে, এবং 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' এই শ্লোকের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। গত ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এই পুষ্করিণীর সংস্কার-কার্য্য মহান্ত বেলপাত গিরি দ্বারা সম্পন্ন হয়। এক্ষণে বুদ্ধ মন্দিরের সীমার ভিতর হইতে কেহ কিছু স্থানান্তরিত করিতে পারিবেক না, স্থানীয় মাজিষ্ট্রেটের এইরূপ আদেশ আছে। যাহা কিছু ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাইতেছে তৎ সমুদয় রক্ষার্থে একটি ঘর হইয়াছে; মন্দিরের তত্ত্বাবধান ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক কার্য্যের ভারবহন করিবার জন্য একজন সরকারি কর্ম্মচারী ও একজন চাপরাশী নিযুক্ত আছে। সীমার বাহিরে কৃষকেরা মৃত্তিকা খনন করিয়া অনেক সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি বাহির করিয়াছে। কেহ কেহ উহার দুই একটিকে গৃহপ্রাচীরে বসাইয়া দিয়াছে; কূপ, শস্যক্ষেত্র ও পথের ধারে অনেকগুলি বসান ও শয়ান আছে; হিন্দু দেব দেবীর মন্দিরে উহা সিন্দূর চর্চ্চিত হইয়া দেবতানির্বিশেষে পূজিত হইতেছে।

বোধ-গয়া হইতে অর্দ্ধক্রোশেরও কম দূরে দক্ষিণে উরুভিল গ্রাম। ইহার আধুনিক নাম মুচারিণ। পালি ভাষায় মুছলিন আখ্যায় এই গ্রামের উল্লেখ আছে। বুদ্ধদেব এইখানে ছয় বৎসর কাল ধ্যানে অতিবাহিত করেন। এখানে একটি বহুদিনের পুষ্করিণী আছে। তাহার নিকটে একটি মন্দির ছিল, উহার বুনিয়াদ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। ইহার অদূরে আর একটি মন্দির ছিল। দুইটির উল্লেখ পালিগ্রন্থে আছে। শেষোক্তটি তখনও বনমধ্যে এখনও না হয় উপবন মধ্যে। ইহার বুনিয়াদ পর্য্যন্ত নাই, তবে কিয়ৎপরিমাণে উচ্চ ঢিবির মত একটু স্থান অবস্থিতিস্থান নির্দ্দেশ করিতেছে।

EXTRACT FROM INDIAN MAGAZINE REVIEW.

August 1896.

SHANTINIKETAN.

If you turn to the map of Bengal, you will find a comparatively unimportant station on the Loop Section of the East Indian Railway. The name of that station is Bolpore. It has a pretty large trade in coarse rice. Bolpore can be reached within a few hours from Calcutta; but to that I do not attach

any importance. What draws people afar is the "Shantiniketan," or Hermitage of Peace, of the Grand Old Man of Calcutta, now living there in retirement, and known all over the Theistic world as Maharshi Debendra Nath Tagore. The hermitage is a little more than a mile from the railway station. There is no conveyance here worth the name, except an inferior kind of bullock cart, which, as its name which, as its name implies, is used more for carrying goods than the fragile piece of ingenious mechanism called for the sake of brevity and convenience—Man. Even this conveyance is not cheap; so the visitors prefer walking. The land on which Bolpore is situate is high and undulating; the soil is sandy, gravelly, and consequently barren. It is interspersed with copsewood of dwarf date-palm and fringed with straggling groups of huts of Sonthals. It is far from human habitation; the road which leads to it, and on which the carts ply, is macadamised, and runs through obscure villages to Seuri, the chief town of the district of Birbhum of which Bolpore is a sub-division.

The vast compound comprises twenty biggahs. In the north-east corner is built the 'mandir' ornamented with various coloured pieces of glass, the framework being of wrought iron and the outer work of the enclosure, with four gates in four directions, being of cast iron. It is a mosaic piece of architecture, making, as it does, an attempt to approach the Gothic style. The frontage refreshes the eye with the Theistic motto Om Tat Sat, in Bengali characters of gold. Its basement is a quadrangular space covered all over, like the worship hall, with black and white pieces of marble tastefully set. There are flights of steps of well-polished sandstone built on all sides. Unlike the Christian churches, the congregation sits cross-legged on long lines of costly carpet seats. This idea is entirely indigenous. During service, especially during the anniversary service, which is held on the 7th day of Pous (corresponding with the 21st or 22nd of December), the hall is lighted with chandeliers, some of which are coloured, while the steps groan under weight of basketfuls of articles of charity, say, rice and cloth, to be doled out to the paupers.

On that memorable day a fair is held, and the public are catered for with entertainments outside the compound. In the centre of the *nikatan* stands a well ventilated two-storied house for the accomodation of guests; almost opposite are the outhouses. The ground is laid out with parterres and beds of arums and other flower-plants. Choicest trees of delicious fruits, like the mangoe and lichu, occupy the sourthern portion of the garden, round about the beautiful brick built house just mentioned, which overlooks the common for miles altogether. Under some of the big trees, among which the ancient *chatim* tree, under which the Maharshi once used to pass his morning and evening in divine contemplation, deserves special mention; those of a contemplative turn of mind are provided with low brick-built cemented seats. In the southern gateway are inscribed texts from the *Brahmo Dharma*, compiled by the venerable old man, inserted on white marble slabs in the pillars thereof.

Neither animal food, nor *hom* (or sacrificial fire) nor any sacrificial offering, nor any spirituous liquor is allowed within the compound. One may stay here for a month, if one likes; but the officer in charge is no way bound to provide boarding. He who wishes to stay here for a longer period should apply to one of the trustees for permission; in all cases he should be one who believes in Theism. During holidays, especially during the Durga Poojah holidays, the influx of Brahmo visitors is large. Nor is this all. Since the establishment of this hermitage, the simple-hearted folk of both sexes come over here bodily to satisfy their curiosity only, from not only the adjacent villages but also from the remote ones like Mankar and Gushkara.

Nakur Chundra Bisvas.
Shantiniketan, Bolpore, E. I. R. Loop,
June 1896.

"ভারতে স্বাধীন আর্য্যমিশন" পত্রসম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য।

১৩ই কার্ত্তিকের তত্ত্বকৌমুদী আত্মবিস্মৃতি শীর্ষক একটি প্রবন্ধে এই বলিয়া আমাদের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমরা বিরোধী মতাবলম্বী শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের পত্র পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়া তাঁহার সহায়তা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার এরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই যেহেতু আমরা প্রেরিত পত্রের

গোড়াতেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দিয়াছি যে, পত্রপ্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক কোনো অংশে দায়ী নহেন। হিন্দু-সমাজের কোন্ শ্রেণীর লোকে ব্রাহ্ম-সমাজকে কি ভাবে দেখেন তাহা ব্রাহ্ম-সমাজের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে জ্ঞাত করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় পত্রখানি তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক দলের মত, সমাজ সংগঠন এই ভাবে হওয়া উচিত—আর এক দলের মত আর এক ভাবে হওয়া উচিত, আর এক দলের মত তৃতীয় আর এক ভাবে হওয়া উচিত—এইরূপ নানা দলের নানা মত। এ অবস্থায় শত্রুমিত্র উভয় দলের মতামত জানিলে আমরা অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে সাবধান হইতে পারি। শত্রুর বাক্যে অনেক সময়ে আমাদের চক্ষু ফুটে—বন্ধুর বাক্যে অনেক সময়ে আমাদের চক্ষুতে কপাট পড়িয়া যায়। এইরূপ বিবেচনায় পত্রখানি ঐতিহাসিক বোধে পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, আর কোন কারণে নহে।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

বহু সম্মাননীয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার
সম্পাদক মহাশয়েষু

মহাশয়,

বিগত আশ্বিন মাসের তত্ত্ববোধিনীতে "ভারতে স্বাধীন আর্য্যমিশন" নামক একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রে লেখকের ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছি। এই জ্ঞানোজ্জ্বল খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের প্রভাব যেন সারদা বাবুকে একটুও স্পর্শ করে নাই। তিনি জোর করিয়া বর্ত্তমানে সেই আদিম যুগের অবতারণা করিতে ইচ্ছুক। তাহা যে নিতান্তই অসম্ভব তাহা তাঁহার কল্পনাচক্ষের সম্মুখে আসিতেই পারে নাই। সেই আদিম যুগে জাতিভেদের বিশেষ উপকারিতা ছিল, এখন জাতীয় ঐক্যের উপকারিতা সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইতেছে। বর্ত্তমান কালে যে দিকেই দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে যে সকল মনুষ্য সকল জাতি কায়মনোবাক্যে ঐক্য প্রার্থনা করিতেছে। এই অবস্থায় তাঁহার আপনার মনোমত জাতিভেদ রক্ষার জন্য সকলকে আহ্বান করা কেমন অসঙ্গত ঠেকিতেছে। তাহার উপর তিনি আপনার মত ব্যক্ত করিবার জন্য এমন ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন যে তাহাতে বিস্ময় ও দুঃখ আসিয়া হৃদয়কে নিতান্তই পীড়া দিতেছে। সারদা বাবুর "অমরনাথ" প্রভৃতি দু একখানি পুস্তক এবং এই তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া তাঁহাকে প্রবীণ ও বিজ্ঞ বলিয়া জানিতাম; তাঁহার লেখনী হইতে এরূপ ভাষা বাহির হওয়া উচিত হয় নাই।

সারদা বাবু নিজের "স্বাধীন আর্য্য মিশনের" স্বপ্নে উত্তেজিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সুতীব্র ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারই দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি যদি ব্রাহ্মসমাজের দোষগুণ বন্ধুভাবে দেখাইয়া দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজের এবং তাঁহার আর্য্য মিশনের মর্য্যাদা রক্ষিত হইত। তাঁহার "স্বাধীন আর্য্য মিশন" প্রতিষ্ঠার একটী উদ্দেশ্য যদি ইহা হয় যে জগতে ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত হউক, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি আমার এই অনুরোধ যে, তিনি যেন রূঢ় ও কঠোর ভাষায় অপরাপর সমাজ বা সম্প্রদায়কে আক্রমণ না করিয়া বন্ধুভাবে দোষগুণ দেখাইতে চেষ্টা করেন, তাহাতে উভয় পক্ষেই মঙ্গল হইবে—শান্তিবায়ু প্রবাহিত হইয়া বিরোধ বিবাদ নির্ব্বাণ করিয়া দিবে। অবশেষে আমি আক্ষেপের সহিত বলিতেছি যে সারদা বাবুর পত্রখানি প্রকাশিত হওয়া উচিত হয় নাই। পত্রখানি একেবারেই প্রকাশিত না হইলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইত, অন্ততঃ ব্রাহ্মসমাজের একটুকুও ক্ষতি হইত না এবং ইহা প্রকাশিত হওয়াতেও ব্রাহ্মসমাজের কোনই লাভ হইয়াছে বোধ হয় না।

কস্যচিৎ ন্যায়দর্শিনঃ।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দশ কল্প।
দ্বিতীয় ভাগ।
পৌষ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।

৬৪১ সংখ্যা ১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रय सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ।

"ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যৎ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥"

গৃহস্থ ব্রহ্ম-নিষ্ঠ হইবেন, তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন এবং তিনি যে কোন কর্ম্মই করুন, তাহা পর-ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন।

ব্রহ্ম-লাভের প্রত্যাশায় কাহাকেও সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিতে হইবে না। বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট সংসারাশ্রমে থাকিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই পুরাতন শাস্ত্রের অভিপ্রায়। মঙ্গল-বিধাতা আমাদিগকে যে অবস্থায় যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন, তৎপ্রতি সন্দিহান হইলে, মঙ্গলময়ের ব্যবস্থাকে অমঙ্গলকর ভাবিলে, তাঁহার পবিত্র বিধানে বীতরাগ হইলে আমাদিগের মঙ্গল হইবে না। তিনি আমাদিগকে যে সংসারে পাঠাইয়াছেন, সেই সংসার তাঁহার ধর্ম্ম-সাধনের প্রতিকূল, ইহা কল্পনা করা স্পর্দ্ধার কথা!

তরণী সমুদ্র-পারে গম্য স্থানে যাইবার উপায়; কিন্তু তাহাকে বিপরীত পথে চালনা করিলে সে আমাদিগকে তীর্থ হইতে ক্রমশঃ দূরে লইয়া যায়। আলস্য বশতঃ তাহার কর্ণ পরিত্যাগ করিলে সে আমাদিগকে আবর্ত্তের মধ্যে ঘূর্ণ্যমান করিয়া রসাতলের মধ্যে নিমজ্জিত করে; আকাশের ধ্রুবতারার প্রতি লক্ষ্য স্থাপন না করিলে সে আমাদিগকে দিগ্‌ভ্রান্ত বিনাশের মুখে, জলমগ্ন শৈলশৃঙ্গের উপরে নিক্ষেপ করিয়া করাল মৃত্যুর কবলে সমর্পণ করে; কিন্তু সেই জন্য কে বলিবে, যে, তরণী পরিহার্য্য? সুপথে এবং বিপথে উভয় পথে যাইবার উপায়ই তরণী। যে ব্যক্তি তাহাকে বিপথে চালনা করে—দোষ তাহারই, দোষ তরণীর নহে।

এই সংসারও সেইরূপ তরণী; ইহাকে অবলম্বন করিয়া আমাদের সেই পরম ধামে চরম-শান্তি-নিকেতনে উপনীত হওয়া যায়। আবার ধ্রুবতারার প্রতি জাগ্রত লক্ষ্য স্থির না রাখিয়া, অনুকূল বায়ুকে উপেক্ষা করিয়া, শুভ বুদ্ধি-নামক বিধি-দত্ত কর্ণকে প্রবৃত্তি-তরঙ্গের উপরে নিশ্চেষ্ট ভাবে ছাড়িয়া দিয়া এই সংসার-

তরণীর দ্বারাই নিরুপায় নিঃসহায় নিদারুণ বিনাশের মধ্যেও অবতীর্ণ হওয়া যায়।

আমরা যদি ইচ্ছা করিয়া পবিত্র সংসারকে অপবিত্র করি, পরমকল্যাণ-সেতু-সংসারাশ্রমকে পাপে কলুষিত করি, তাঁহার কৃপা-লব্ধ স্বাধীনতাকে জঘন্য স্বেচ্ছাচারে পরিণত করি, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার অবশ্যম্ভাবি ফল দারুণ দুঃখ-দুর্ব্বিপত্তি ভোগ করি, তাহা হইলে সেই অপরাধ কি তাঁহার, না তাঁহার সংসারের? সংসারে যে ভাবে যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, যে প্রণালীতে যাহা ব্যবহার করিলে, যে ইন্দ্রিয় যে ভাবে পরিচালিত হইলে আমাদের কল্যাণ হয়, তাহাই তাঁহার প্রিয়কার্য্য এবং তাহা দ্বারাই ক্রমশঃ আমরা তাঁহার প্রেম-সম্মিলন প্রাপ্ত হই। তাহা না করিয়া—স্বেচ্ছাচারের অধীন হইয়া আমরা যদি প্রতি কার্য্য প্রতিকূল ভাবে অনুষ্ঠান করি, তবে তজ্জন্য দুর্ব্বিপত্তি-ভোগ আমাদের অখণ্ডনীয় ও অলঙ্ঘনীয়! কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার, অথবা তাঁহার সংসারের অত্যাচার কল্পনা করা সুবিচার-সম্মত নহে।

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।"

শ্রেয় এবং প্রেয় এই উভয়ের মধ্য হইতে মনুষ্য নিজের পথ বিবিক্ত করিয়া লইবেন। এই বিবেক-শক্তিই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, এই খানেই আমাদের আত্ম-কর্তৃত্ব,—আমাদের স্বাধীনতা। ঈশ্বর আমাদিগকে জড়-পদার্থের ন্যায় আমোঘ শক্তির দ্বারা শ্রেয়ঃপথে প্রবৃত্ত করিতেছেন না, তিনি আমাদিগকে স্বেচ্ছা-সহকারে শ্রেয়ঃ পথ বাছিয়া লইবার শক্তি দিয়াছেন। প্রবৃত্তির প্রিয় এবং আত্মার কল্যাণ হইতে স্বেচ্ছায় কল্যাণ-পথ বুঝিয়া চলিতে দিয়াছেন।

যেস্থানে এই শ্রেয় এবং প্রেয়ের বিরোধ নাই, সেখানে আত্মার কর্তৃত্ব-শক্তি চালনার অবসর নাই, সেখানে আমরা বৃক্ষলতাদি অচেতন পদার্থের সমান; সেখানে আমাদের শিক্ষা নাই, উন্নতি নাই; সেখানে সচেতন-ভাবে প্রত্যক্ষ-ভাবে আত্মশক্তি উপলব্ধি করিবার অবকাশ নাই; অতএব সে স্থান কখনও আত্মার পালন-স্থান নহে, তাহা জড়-পদার্থের জন্ম-ভূমি!

এই সংসার শ্রেয়ঃপ্রেয়ের মধ্য-স্থলে অবস্থিত। শ্রেয় ইহার সুমেরু এবং প্রেয় ইহার কুমেরু;—ইহার সকল পথেরই এক প্রান্তে শ্রেয় এবং এক প্রান্তে প্রেয়। এই জন্যই এই সংসার প্রকৃষ্টরূপে আত্মার সংগ্রাম-ক্ষেত্র। এই শ্রেয়ঃপ্রেয়ের বিপরীত-ঘর্ষণে যে তাপ উৎপন্ন করে, তদ্দ্বারা আত্মার নিগূঢ়-নিহিত স্বর্গীয় বিবেকাগ্নি সমস্ত হেয়—সমস্ত নশ্বর পদার্থ-রাশিকে ভস্মীভূত করিয়া ক্রমশঃ দেদীপ্যমান হইয়া উঠে এবং আত্মা তাহার অন্তর্গূঢ় অবিনশ্বর জ্যোতিকে প্রত্যক্ষ সমুজ্জ্বল-ভাবে লাভ করে।

হায়, তথাপি আমরা নিজের সমস্ত দোষ সংসারেরই প্রতি আরোপ করি। আমাদের অসংযত প্রবৃত্তি আমাদিগকে বিপথে লইয়া গেলে সে অপরাধ সংসারের নহে; সংসার পরিত্যাগ করিয়া এই উদ্দাম প্রবৃত্তিগুলিকে নাশ করা যায় না; তাহাদিগকে সুপ্ত করিয়া রাখা হয় মাত্র। তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া দুঃখের অগ্নিতে তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া, আত্মা যে বল এবং উজ্জ্বলতা লাভ করে, সংসার হইতে দূরে থাকিয়া, আত্মাকে তাহা

হইতে বঞ্চিত করা হয় মাত্র। ভগবদ্গীতা বলিতেছেন—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥"

পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কখনও নিষ্কাম হইতে পারে না এবং কর্ম্ম-জনিত চিত্ত-শুদ্ধি বিনা বাহ্য সন্ন্যাস-দ্বারা সিদ্ধি-লাভ করিতে পারে না। কর্ম্মের সমীচীন সাধন এবং কর্ম্ম-দ্বারাই কামনার মূলোৎপাটন করিতে হয়। সংসারই সংযম-শিক্ষার স্থান; সংসারের প্রতি-কার্য্যে সংযম-শিক্ষার এত প্রকৃষ্ট পদ্ধতি রহিয়াছে, যে, তজ্জন্য সাজিয়া গুজিয়া নূতন কোন সংযম-শিক্ষার আশ্রম নির্ম্মাণ করা নিতান্তই বাহুল্য হইয়া পড়ে।

আর একটি বিশেষ কারণে সংসারকে অপরাধী করা হইয়া থাকে। অনেকে বলেন সংসার আমাদিগকে স্থায়ী আশ্রয় দেয় নাই; সংসার যখন নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিবে, তখন সংসারকে কেন না আমরা পরিত্যাগ করিব? এককালে যখন বন্ধন শিথিল হইবেই, তখন এ বন্ধনে আপনাকে কেন আবদ্ধ করি? মৃত্যুই যখন সংসারের ধর্ম্ম, তখন বৃথা সংসারের অবলম্বন!

এ যুক্তি কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। মৃত্যুকে আমরা ভুলিয়া থাকি; কিন্তু মৃত্যু আমাদিগকে মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলে না! সংসারের সকল বস্তুর পৃষ্ঠেই সে আপনার অধিকার-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। যখনি সে যাহার প্রতি কর প্রসারণ করে, তখনি সে শীর্ণ বিবর্ণ-মুখে বিনা-প্রতিবাদে আত্ম-সমর্পণ করে।

কিন্তু এই মৃত্যু আছে বলিয়াই, কোন এক সময় অজ্ঞাতসারে আমাদের জীবনের সমস্ত চেষ্টা অবসান হইবে বলিয়াই, সংসারকে স্বেচ্ছাক্রমে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে পরিহার করা কর্ত্তব্য নহে। বৃক্ষের ফলকে এক সময় বৃন্ত-চ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে হয়, সেই তাহার শেষ পরিণাম; কিন্তু সেই জন্যই সে যদি বৃন্তের বন্ধন—শাখার আশ্রয়—অকালে পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করে, তবে কদাচ সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। আম্রফল তরুণ অবস্থায় কঠিন কৃষ্ণবর্ণ অম্লরস যুক্ত থাকে, অবশেষে সে যখন বহু-দিবসের সূর্য্য-কিরণ ও বৃষ্টি-পাতের দ্বারা আহত অভিহত উত্তপ্ত হইয়া পরিণতি লাভ করে, যখন সে সুকোমল স্বর্ণ-বর্ণ সুগন্ধ-যুক্ত হইয়া উঠে, তখন তাহার বৃন্ত শিথিল হইয়া আসে, তখন সে আপন শস্যের দ্বারা জীবের ক্ষুধা দূর করিয়া, আপন স্বাদু রসের দ্বারা ভোক্তার মনোহরণ করিয়া, আপন বীজের মধ্যে অমরতা লাভ করিয়া নব-জন্মের পথে যাত্রা করে। সংসারের পক্ষে আমাদেরও শেষ পরিণাম মৃত্যু। সেই জন্য, সেই মৃত্যু আসিবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে, শাখাই যেমন ফলের পরিপক্বতা-সাধনের অবলম্বন, সংসারই তেমনি আমাদের প্রস্তুত হইবার স্থান। অতএব মৃত্যু আছে বলিয়াই, সংসারে আমরা চির-স্থায়ী হইব না বলিয়াই, সংসারের সমুদয় শিক্ষা আমাদিগকে তৎপূর্ব্বে একান্ত যত্নে গ্রহণ করিতে হইবে। যখন আমাদের জীবন-বৃন্ত শিথিল হইবে, সামান্য বায়ুর আঘাতেই অকস্মাৎ এই সংসার-বনস্পতির শাখা হইতে চ্যুত হইয়া পড়িব, তখন যেন আমাদের সমস্ত কাঠিন্য, সমস্ত কালিমা দূর হয়, তখন যেন মধুর রসে আমাদের সমস্ত অন্তঃপ্রকৃতি ওত-প্রোত হইয়া যায়, তখন যেন আমাদের আত্মার

মধ্যে অনন্ত জীবনী-শক্তি পরিণত ও বিকসিত হইয়া উঠে; তখন, যাহা পরিত্যাগ করিলাম, তাহা অপেক্ষা যাহা লাভ করিলাম, তাহা যেন অনন্ত গুণে বৃহৎ হইয়া আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়।

এই সংসার-বনস্পতি, জীব-লোকের এই অক্ষয় বট, অনন্ত আনন্দ-স্বরূপের আনন্দ অমৃত-রস শোষণ করিয়া চিরকাল শাখা-প্রশাখা ফল-পুষ্প-পল্লবে সঞ্জীবিত হইয়া রহিয়াছে; ইহারই বৃন্ত আশ্রয় করিয়া, ইহারই মজ্জার মধ্য হইতে সেই বিচিত্র শিরায় সঞ্চারিত অমৃতরস সম্পূর্ণ রূপে শোষণ করিয়া আমাদের আত্মা পরিণতি লাভ করে; স্বর্গ হইতে ইহার উপরে সুখ-দুঃখের যে রৌদ্র-বৃষ্টি নিপতিত হইতে থাকে, তাহা ইহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

সাধারণ মানবের সহিত বিশেষ মানবের যে সম্বন্ধ, তাহাই সংসার-বন্ধন, সমস্ত মনুষ্য-জাতির সহিত, স্বদেশীয়ের সহিত, প্রতিবেশীর সহিত, আত্মীয় পরিজনের সহিত, আমাদের যে সম্বন্ধ, তাহাই সংসার-বন্ধন, যখন মনুষ্য হইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি, তখন মনুষ্য সাধারণের সহিত সেই সম্বন্ধ-বন্ধন ঈশ্বরের স্বহস্ত-কৃত, তাহা মঙ্গল-বন্ধন, তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানবজন্মের প্রতি ব্যভিচার করিয়া আমাদের কল্যাণ নাই। বৃন্তের বন্ধনকে ভয় করিয়া যেমন ফল-পুষ্পের কল্যাণ নাই, সংসার-বন্ধনকে ভয় করিয়া তেমনি আমাদের কল্যাণ নাই। মানবজাতির প্রতি প্রীতি, স্বদেশের প্রতি প্রীতি, প্রতিবেশীর প্রতি প্রীতি, আত্মীয় পরিজনের প্রতি প্রীতি, সেই পরম-প্রেমেরই বিচিত্র ধারা, ইহাই সর্ব্বদা সচেতন ভাবে অনুভব করিয়া, পরমদেবের প্রসাদ-সুধা-স্বরূপ এই প্রেমকে সর্ব্বদা নির্ম্মল পবিত্র রাখিয়া, এই পিতা-মাতার বাৎসল্য, বন্ধুর সৌহার্দ্দ, ভ্রাতার সৌভ্রাত্র, সতী স্ত্রীর প্রেম-নিষ্ঠার মধ্যে তাঁহাকে জীবন্ত সলঙ্গ-স্বরূপে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া চলিলে জীবনের পরিণাম অমৃতময় হইয়া উঠে।

সংসারের সমস্ত প্রেম, সমস্ত আনন্দ তাঁহার অনন্ত প্রেম অনন্ত আনন্দের কণা-মাত্র, "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি"—ইহা উজ্জ্বল ভাবে নিত্য অনুভব করিলে, সংসারের সমুদয় কর্ম্ম তাঁহার পদে উৎসর্গ করা সহজ হয়। যদি ইহা সর্ব্বদা বোধ করিতে পারি, যে, পিতার বাৎসল্য তাঁহারই বাৎসল্য, ভ্রাতার প্রেম তাঁহারই প্রেম, তবে পিতার প্রতি কর্ত্তব্য, ভ্রাতার প্রতি শুভ চেষ্টা তাঁহারই কর্ম্ম বলিয়া স্বতঃ তাঁহারই প্রতি ধাবিত হয়। তখন সংসারের সমস্ত দুঃখ-শোকের ভার লাঘব হইয়া যায়; সমস্ত দুরূহ শুভানুষ্ঠান সহজ-সাধ্য হইয়া আসে। নতুবা, সংসারের সমস্ত স্নেহ-প্রেমকে যদি নশ্বর স্বার্থ-সীমার মধ্যে সঙ্কীর্ণ করিয়া বদ্ধ করা যায়, যদি সংসারের সমস্ত কর্ম্মকে আমার কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করা যায়, তবে কর্ম্মের ভার অত্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠে, তবে স্নেহে প্রেমে চিত্তকে উদার না করিয়া, তাহাকে ঊর্ণনাভের লূতাতন্তুর ন্যায় জড়িত বিজড়িত করিয়া দেয়,—এবং মৃত্যু যখন সহসা আসিয়া আমাদিগকে সংসার হইতে বিচ্যুত করিতে চায়, তখন কঠিন বন্ধন আমাদের মর্ম্মচ্ছেদ করিতে থাকে এবং শঙ্কাতুর ব্যাকুল-ক্রন্দন মুগ্ধ-হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

এই জন্যই শাস্ত্রে আছে—"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ"—ব্রহ্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তি গৃহস্থ হই-

বেন এবং গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্ম-নিষ্ঠ হইবেন; "রসোবৈ সঃ" ব্রহ্ম রস-স্বরূপ, ব্রহ্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তি সেই ব্রহ্ম-রস গৃহের সমস্ত দয়া-ভক্তি স্নেহ-প্রেমের মধ্যে নিত্য নব-নব রূপে আস্বাদন করিবেন। "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ" তত্ত্বজ্ঞানালোকের সাহায্যে গৃহের সমস্ত স্নেহ প্রেম কল্যাণ 'এতস্যৈবানন্দস্য' মাত্রারূপে উপলব্ধি করিবেন এবং "যৎ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ" যে কোন কর্ম্ম করিবেন, তাহা ব্রহ্মকেই সমর্পণ করিবেন। এরূপ করিলে মানব-জন্ম সফল হইবে, সংসার-বাস সার্থক হইবে এবং এই সংসারকেই শেষ পরিণাম অথবা বিরাট মায়া-জাল বলিয়া ভ্রম হইবে না।

এই সুমহৎ লক্ষ্যের কথা মনে রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিলেই আমাদের কল্যাণ ও শান্তি; অন্যথা লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া প্রতিকূলাচরণ করিলে, প্রাণের গুপ্ত গভীর পিপাসা কিছুতেই নিবৃত্ত হইবে না। সংসারের যাবতীয় কার্য্য তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করিলেই তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করা হয়। একই কার্য্য, একই দর্শন, স্পর্শ, শ্রবণ, আস্বাদন, কিন্তু লক্ষ্যভেদ। লক্ষ্য-ভ্রষ্ট সংসারী সংসারের জন্যই কার্য্য করেন, লক্ষ্য-নিষ্ঠ সংসারে সমস্ত কার্য্যই করেন—বিধাতার নিয়োগ ভাবিয়া। লক্ষ্য-ভ্রষ্ট সংসারী অর্থোপার্জ্জন করেন, পরিবার প্রতিপালন করেন, সকলকেই যথাযোগ্য প্রেম-প্রীতি দান করেন, সংসারের জন্য—স্বার্থের জন্য—আদান প্রদানের ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য; লক্ষ্য-নিষ্ঠ সেই সমস্তই করেন—বিধাতার অবশ্য প্রতিপালনীয় অলঙ্ঘনীয় বিধি বুঝিয়া, তাঁহার উপাসনা ভাবিয়া! একই কার্য্য সকামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে বন্ধনের হেতুভূত হয় এবং ভগবৎ-কামনায় অনুষ্ঠিত হইলে মুক্তির সাধন হয়। সংসারকে ভগবৎ-প্রাপ্তির সাধন করিতে পারিলেই সংসার সারসামগ্রী হয়। শাস্ত্র বলেন—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকে, সেই মূঢ়াত্মা মিথ্যাচার বলিয়া অভিহিত হয়।

"বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিনাং
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্॥"

বিষয়ানুরাগী ব্যক্তির বনবাসেও দোষ সমুৎপন্ন হয়, গৃহস্থের পঞ্চেন্দ্রিয় সংযম ও তপস্যা। যিনি অনাসক্ত হইয়া শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার সংসারই তপোবন!

হে বেদ-বেদান্ত-প্রতিপাদ্য—সত্য মঙ্গলের আকর, হে প্রেমময়, তুমিই আমাদিগকে অনন্ত-সুখ-সৌভাগ্যের অধীশ্বর করিয়া সমুন্নত জ্ঞান-প্রেমের পূর্ণাধিকারী করিয়া সংসারের কঠোর পরীক্ষায় প্রেরণ করিয়াছ, তোমার কৃপায় আমরা যেন এই কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি। নিরন্তর প্রলোভন-শার্দ্দূল করাল মুখ ব্যাদান করিয়া আমাদিগকে কবলিত করিবার উদ্‌যোগ করিতেছে, নিরন্তর হৃদয়ের প্রতি-গ্রন্থিতে কামনা-বৃশ্চিক কঠোর দংশন করিতেছে, হে করুণার সাগর, অসহায়ের সহায়, তুমি আমাদিগকে প্রলোভনের হস্ত হইতে—কামনার দংশন হইতে রক্ষা কর, তাহা না হইলে পাপ-প্রলোভনের মায়া-মরীচিকায় প্রলুব্ধ হইয়া কেবল ছুটিয়া ছুটিয়া প্রাণ হারাইব, আমা-

দের সংসারে আসা মিথ্যা হইবে। তাই বলি হে দুর্ব্বলের বলদাতা, সংসার সাগরের ধ্রুবতারা, তুমি আমাদের দুর্ব্বলতা দূর কর এবং সংসারে থাকিয়া কি করিয়া তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হয়, কি রূপেই বা তোমার সাধন ও সংসারকে এক-সূত্রে অনুস্যূত করিতে হয়—তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

।১৩। ব্রাহ্মসমাজে দ্বৈতবাদ।:

পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাপত্র হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে ব্রাহ্মসমাজ দ্বৈতমতই স্বীকার করিয়াছেন। আর প্রকৃত দ্বৈতমত স্বীকার না করিলে উপাস্য-উপাসকভাব আসিতে পারে না—ঈশ্বর পিতা আমি পুত্র, তিনি প্রভু আমি দাস, তিনি উপাস্য আমি উপাসক। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ব্রাহ্মসমাজে পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদ প্রচলিত ছিল। একথা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। রাজা রামমোহন রায় বেদান্তসূত্রের যে টিপ্‌পনীর সহিত অর্থ করিয়া গিয়াছেন এবং ভট্টাচার্য্যের সহিত তাঁহার যে বিচার চলিয়াছিল তাহা হইতেই কয়েক স্থান উদ্ধৃত করিলেই এ বিষয় বোধগম্য হইতে পারিবেক। তিনি একস্থানে বলিতেছেন যে "জীব আনন্দময় না হয় * * যেহেতু জীব আর ব্রহ্মের ভেদ বেদে দেখিতেছি।" তিনি দুই তিন স্থানে বেদবেদান্ত হইতে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে "বিবর্ত্তরূপে ব্রহ্ম জগৎ-কারণ হয়েন * * বিবর্ত্ত শব্দের অর্থ এই যে আপনি নষ্ট না হইয়া কার্য্যরূপে উৎপন্ন হয়েন।" রামমোহন রায় শ্রুতির দ্বারা স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে "ব্রহ্ম এই সকল অনুভূত বস্তুর মধ্যে কিছুই নহেন এই মাত্র ব্রহ্মের নির্দ্দেশ, ইহা ভিন্ন আর নির্দ্দেশ নাই। সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে যে জগৎ তাহার মধ্যে যথার্থরূপে যে সত্য তিনিই ব্রহ্ম; প্রাণ প্রভৃতি ব্রহ্ম নহেন, তাহার মধ্যে সত্য যে বস্তু তিনিই ব্রহ্ম হয়েন।" তিনি অনেকবার এই ভাবে বলিয়াছেন যে "যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পায় বস্তুত সে রজ্জু সর্প হয় এমত নহে। সেইরূপ সত্যস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তিনি মিথ্যারূপ জগৎ বাস্তবিক হয়েন না।" তিনি যে প্রচলিত বৈদান্তিক মতের বিরুদ্ধ ছিলেন, সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত প্রভৃতি পড়াইবার বিরুদ্ধে তাঁহার প্রার্থনা পত্র দেখিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। * "শঙ্করাচার্য্য যেরূপ বেদান্ত-দর্শনের অর্থ করিয়াছেন, রামমোহন রায় আপনার স্বাধীন বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া তাহা হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। ইহা দ্বারভাঙ্গা-প্রবাসী চন্দ্রশেখর বসু তাঁহার বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থে স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন।" †

রামমোহন রায়ের পরে যাঁহারা আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরও

---

* Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father, brother &c. have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and there fore the sooner we escape from the world the better.

† বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য—শ্রীরাজনারায়ণ বসু দ্বারা অভিব্যক্ত; বেদান্তপ্রবেশ—শ্রীচন্দ্রশেখর বসু প্রণীত।

ব্যাখ্যান সকল দ্বৈতবাদমূলক, তবে দু-একটী ব্যাখ্যানে অদ্বৈতভাবের আভাস আসিয়া পড়িয়াছে। অদ্বৈতভাবের আভাসযুক্ত দুএকটী ব্যাখ্যান তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিতও হইয়াছিল। ১৭৬৬ শকের ফাল্গুন মাস হইতে যখন শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বহস্তে পত্রিকার ভার গ্রহণ করিলেন ‡ তখন হইতে অদ্বৈতবাদের স্বপক্ষ প্রবন্ধ পত্রিকাতে প্রকাশিত হওয়া রহিত হইল। তিনি বলেন যে যখনই তাঁহার অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল, তখন হইতেই তাঁহার হৃদয়ে উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধ-জ্ঞানও জাগিয়াছিল। এই ভাব তিনি একমাত্র পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কাহারও সহায়তায় প্রাপ্ত হন নাই।

দ্বৈতমত গ্রহণ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ ঋষিদিগেরই পদানুসরণ করিয়াছেন। মুণ্ডক ঋষি বলিতেছেন

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নোহভিচাকশীতি।"

দুই সুন্দর পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা একত্রে থাকেন এবং উভয় পরস্পরের সখা; তন্মধ্যে একটী সুখেতে ফলভোজন করেন, অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন।"

"সমানে বৃক্ষে পুরুষোনিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ।"

জীবাত্মা শরীর মধ্যে নিমগ্ন রহিয়া এবং দীনভাবে মুহ্যমান হইয়া সর্ব্বদাই শোক করিতে থাকে; কিন্তু যখন সর্ব্বসেব্য ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখিতে পায়, তখন তাহার আর শোক থাকে না। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন

"প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ।
উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥"

প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রী-মন্ত্রের দ্বারা সেই পরব্রহ্মকে উপাসনা করিতে হইবে, যাঁহাতে আত্মা প্রতিষ্ঠিত। এই সকল প্রত্যক্ষ দ্বৈতমতপোষক শাস্ত্রোক্তি বর্ত্তমান থাকিতে আমরা তাহা পরিত্যাগ করিব, বিশেষতঃ যখন আমরা আত্মাতেও এই দ্বৈতভাবেরই সায় পাই? দ্বৈতবাদ অবলম্বন করিলে আমাদের সঙ্গে কাহারও বিরোধ আসিতে পারে না। আর একটু কথা এই যে, অদ্বৈতবাদীগণের মতে যে অবস্থায় লোকে অদ্বৈত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে, আমাদের ন্যায় গৃহস্থের পক্ষে সেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব, সুতরাং আমাদের পক্ষে দ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া পরব্রহ্মে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন করাই শ্রেয়ঃ। দ্বৈতবাদের স্বপক্ষে বেদান্তসূত্র হইতেও যথেষ্ট প্রমাণ পাই। বেদান্তসূত্র যখন বলিতেছেন যে জীবাত্মার সৃষ্টিকার্য্যে অধিকার নাই "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং" (বে, সূ, ৪।৪।১৭) এবং পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মাত্র আনন্দ-ভোগে সাম্য আছে "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ" (বে, সূ, ৪।৪।২১), তখন আর বেদান্তদর্শনের নাম লইয়া বৃথা কলহবিবাদে প্রয়োজন কি?

১৪। ব্রাহ্মসমাজে আত্মপ্রত্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ ঋষিদিগের পদানুসরণ করিয়া যেমন দ্বৈতমত গ্রাহ্য করিয়াছেন, সেইরূপ ঋষিদিগেরই পদানুসরণ করিয়া আত্মপ্রত্যয়কে আত্মার একমাত্র পথপ্রদ-

‡ তাঁহার নিকট শুনিয়াছি যে যখন হইতে উপনিষৎ বাহির হইতে লাগিল, তখন হইতেই তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকৃত ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে বয়োবৃদ্ধ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আচার্য্যপদে আসীন থাকিয়া যে সকল ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তাহা বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের খাতিরে বিনা বাক্যব্যয়ে প্রকাশিত হইত। তাহার জন্য তিনি স্বয়ং ভিন্ন অপর কেহই দায়ী হইতে পারেন না।

র্শক করিয়াছেন এবং শাস্ত্রসমূহের যে সকল অংশ সেই আত্মপ্রত্যয়কে পোষণ করে, তাহাও শিরোধার্য্য করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মসমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্ম এবং সেই ব্রহ্মকে যখন উপনিষদ্ জ্বলন্ত ভাষায় "একাত্মপ্রত্যয়সারং" একমাত্র আত্মপ্রত্যয়-গম্য বলিয়াছেন, তখন ঋষিরা যে আত্ম-প্রত্যয়কেই আত্মার পথ-প্রদর্শক করিয়া-ছিলেন তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে?

আর আমরাও আত্মাতে সেই কথার সম্পূর্ণ সায় পাইতেছি। মনুও কেমন সুন্দর ভাষায় এই সত্যেরই সমর্থন করিয়াছেন—"হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মস্তন্নিবোধত" হৃদয়ের দ্বারা অর্থাৎ সহজজ্ঞান বা আত্ম-প্রত্যয়ের দ্বারা স্বীকৃত যে ধর্ম্ম তাহা শ্রবণ কর। শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে যাহা হৃদয় অনু-মোদন করিবে, তাহাই শিরোধার্য্য করিব। নানা বেদ, নানা স্মৃতি, নানা পুরাণ, নানা তন্ত্র অনেক বিষয়ে পরস্পরবিরুদ্ধ, "বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।" অথচ তাঁহারা প্রত্যেকে আপনারই কথাকে সত্য ও প্রামাণিক বলিয়া গিয়াছেন, সে অবস্থায় আমরা আত্মপ্রত্যয়কে পথপ্রদর্শক না করিলে আর কে পথপ্রদর্শক হইবে? আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, ঋষিরা যে ভক্তিচক্ষে বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ এবং তদন্ত-র্নিহিত চিরন্তন সত্যকে দেখিতেন, আম-রাও সেইরূপ ভক্তিচক্ষেই তাহা দেখিয়া থাকি কিন্তু ততোধিক ভক্তির ভাণ দেখা-ইতে পারিব না। মহাতেজস্বী মুণ্ডক ঋষি এই বিষয় ধ্যান দ্বারা পর্য্যালোচনা করিয়া কি অগ্নিময় ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন—"অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথ-র্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদ-ক্ষরমধিগম্যতে।" বেদ ও বেদান্ত সকলই অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যাই শ্রেষ্ঠবিদ্যা। বর্ত্তমান কালের ন্যায় ঋষিরা বেদাদির উপর শ্রদ্ধার বাড়াবাড়ি দেখাইতে গিয়া এরূপ কথা বলেন নাই; তাঁহারা যাহা হৃদয়ে সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ভগবদ্গীতাও অযথা বেদবাদের উপর অতি তীব্র ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছেন; বেদবাদীদিগকে মূর্খ কামাত্মাদিগের মধ্যে ধরিয়াছেন। তিনি অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন "ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।"

১৫। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা।

১৭৬৫ শক ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই শকাব্দে ব্রাহ্মসমাজের যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, আজও আমরা তাহার অবিচ্ছিন্নভাবে ফল লাভ করিতেছি। এই বৎসরেই তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল—আজও আমরা তাহার সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিতেছি। এই বৎসরেই পুস্তকাদি মুদ্রাঙ্কন জন্য দেশহিতৈষী মহাত্মা রমা-প্রসাদ রায় সমুদয় অক্ষরের সহিত এক মুদ্রাযন্ত্র দান করিয়াছিলেন, তদবধি তত্ত্ববোধিনী সভার প্রকৃত উন্নতির সূত্র-পাত হইল*—আজও সেই মুদ্রাযন্ত্র হইতে পরিপাটীবেশে কত শাস্ত্রগ্রন্থ, কত ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। এই বৎসরেই ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণ-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল—আজও কত লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মের পথে অগ্রসর হইতেছেন। এই বৎসরেই তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা বংশবাটী গ্রামে সংস্থাপিত হইল। ইংরাজী ভাষাকে মাতৃভাষা এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে পৈতৃক ধর্ম্ম-রূপে গ্রহণ করা, "এই সকল সাংঘাতিক

*তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৬৯ শক পৌষ।

ঘটনার নিবারণ করিতে এবং বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ত্ববোধিনী সভা অদ্য১৭৬৫ সালের ১৮ বৈশাখ রবিবারে এতৎ পাঠশালারূপ নবকুমার প্রসব করিলেন।" * তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় একটী ছাত্র দীননাথ রায় উহার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষাকালে যে রচনা পাঠ করিয়াছিল, তাহাতে উক্ত হইয়াছে "এ দেশহিতৈষি ও বিদ্যোৎসাহি তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষ ও তৎসভ্য মহাশয়েরা আনুকূল্য দ্বারা বংশবাটীগ্রামে এই পাঠশালা সংস্থাপিতা করিয়া নানা ক্লেশে নানা দেশের নানা পুস্তকান্তর্গত ভাবার্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক ও বেদান্তাদি শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া বিনা বেতনে ছাত্রগণকে অনায়াসে শিক্ষা ও জ্ঞান প্রদান করাইতেছেন।" † "স্বধর্ম্মে থাকিয়া ঈশ্বরজ্ঞান দ্বারা চরিতার্থ হইলে কে পরধর্ম্মের আশ্রয় লইবে? স্বধর্ম্মে থাকিয়া যাহাতে ঈশ্বরজ্ঞান সম্পূর্ণ হয়, তন্নিমিত্তেই এই পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। পরমার্থ এবং বৈষয়িক উভয় বিদ্যারই উপদেশ প্রদান করা যাইবে।" ‡ "বালককালাবধি ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ না হইলে তাহার স্ফূর্ত্তি সম্যক্‌রূপে হওয়া দুষ্কর হয়, এজন্য এই সভা হইতে পাঠশালা সংস্থাপনা করিবার বিশেষ তাৎপর্য্য হইয়াছে, * * তাহাতে ইংলণ্ডীয় ও বঙ্গ এবং সংস্কৃত ভাষাতে উপযুক্তমত বৈষয়িক বিদ্যা, বিজ্ঞানশাস্ত্র, এবং ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেওয়া যাইতেছে। ঈশ্বর করেন, তবে এতদ্দেশীয় লোকের উৎসাহ দ্বারা এই প্রকার পাঠশালা স্থানে স্থানে সংস্থাপিতা হইবেক।" * বর্ত্তমানে ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট যে সকল বিদ্যালয় আছে, এই তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাই তাহাদিগকে এ বিষয়ের প্রথম আদর্শ দেখাইয়া দিয়াছে। এই বঙ্গদেশের প্রতি ঈশ্বরের যথার্থই করুণা যে পড়িয়াছে, তাহার পরিচয় স্বরূপে আজ ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট কত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত।

এই তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ১৭৬২ শকে প্রথমে কলিকাতাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিন্তু যে কারণে তাহা বংশবাটীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হইল, তাহার কারণ আমরা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কথাতেই উদ্ধৃত করিতেছি। "প্রথমতঃ যদিও অন্য অন্য উপায় দ্বারা এই ধর্ম্মের অনুশীলন হইতেছিল, কিন্তু (তত্ত্ববোধিনী সভার) সভ্যেরা বিবেচনা করিলেন যে, এরূপ এক পাঠশালা সংস্থাপন করা অত্যাবশ্যক, যাহাতে বালকেরা স্বদেশীয় ভাষাতে বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয় এবং সুশিক্ষিত হইয়া সভার অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে তাঁহাদিগের সহযোগী হয়। সাধারণের আনুকূল্য দ্বারা তাঁহারা ঐ অভিলাষ পূর্ণ করিতে ক্ষমতাবান্ হইলেন এবং সভাস্থাপনের পর দ্বিতীয় বৎসরে কলিকাতা নগরে এক বাঙ্গালা পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিলেন, যে স্থলে অপরাপর বিদ্যালয়ের ন্যায় সামান্যতঃ নানা বিষয়ক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ছাত্রেরা ব্রহ্মজ্ঞানে উপদিষ্ট হইত। সভ্যদিগের অভিপ্রায়মতে প্রথমে কেবল বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত ভাষাতেই ছাত্রদিগকে উপদেশ প্রদান করা যাইত, এবং তাহারদিগের উপস্থিতির সময় প্রাতঃকালে ছয়ঘণ্টা অবধি নয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট থা-

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৬৫ শক, আশ্বিন।
† ১৭৬৬ শক, মাঘ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।
‡ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৬৫ শক ভাদ্র।

* তঃ বোঃ পত্রিকা, ১৭৬২ শক, আশ্বিন।

কাতে তাহারা নয় ঘন্টার পরে অন্য অন্য বিদ্যালয়ে ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু বালকেরা দ্বিগুণ পরিশ্রম সহ্য করিতে অক্ষম প্রযুক্ত ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষার অনুরোধে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল, সুতরাং ছাত্রের সংখ্যা ক্রমে ন্যূন হইয়া পাঠশালা ভগ্নপ্রায় হইল। অতএব অধ্যয়নের উক্ত নিয়ম শোধন করা আবশ্যক হওয়াতে এ প্রকার এক বিদ্যালয় স্থাপন করা যুক্ত বোধ হইল যে ছাত্রেরা ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই কিঞ্চিৎ সময় ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষার জন্য অর্পণ করিতে পারে। সাধারণ উৎসাহ এবং সাহায্য বৃদ্ধি দ্বারা সভ্যেরা উক্ত অভিলাষ পূর্ণ করিতে সাহসী হইলেন—কেবল এই মীমাংসা করিতে অবশিষ্ট থাকিল যে পাঠশালা কলিকাতা বা অন্যত্র স্থিত হইলে অধিক উপকারের সম্ভাবনা। ইহাতে বিবেচনা হইল যে নগরমধ্যস্থ অনেক বিদ্যালয়ে যে প্রকার বিস্তীর্ণরূপে শিক্ষাপ্রদান হয় তাহা এ সভার অল্প আয় দ্বারা কদাপি সম্ভব নহে। ইহাও বিবেচনা হইল যে পল্লীগ্রামে বিদ্যাশিক্ষা এবং ধর্ম্মশিক্ষা উভয়ই অতি মলিন অবস্থায় আছে। অতএব পল্লীগ্রামে বিশেষতঃ যে সকল স্থান পূর্ব্বে বিদ্যার প্রধান আসন ছিল তাহাতেই সভার উপকার বিস্তার করা বিশেষরূপে কর্ত্তব্য বোধ হইল। তদনুসারে কলিকাতায় পাঠশালা রহিত হইয়া ১৭৬৫ শকের ১৮ বৈশাখে বংশবাটীতে এক উক্ত প্রকার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই পাঠশালাকে তাহার মহৎ তাৎপর্য্যের উপযুক্ত করিতে ব্যয় ও যত্নের ক্রটি হয় নাই, এবং সভ্যেরা অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইতেছেন, যে পরমেশ্বর প্রসাদাৎ তাহার অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতই হইতেছে।"*

আমরা তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার কথা এত বিস্তৃত ভাবে বর্ণন করিলাম ইহাই দেখাইবার জন্য যে, যেমন বর্ত্তমান কালে অনেকে উদরান্ন সংস্থানের উপায় ভাবিয়া বিদ্যালয় খুলেন এবং এই কারণে তাহাতে ছাত্রদিগেরও প্রকৃত উপকার ও কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখা হয় না, তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যেরা প্রকৃত দেশহিতৈষণা ও বালকগণের কল্যাণকামনা দ্বারা প্রেরিত হইয়াই উক্ত পাঠশালা খুলিয়াছিলেন এবং এই কারণেই তাহাতে প্রকৃত কল্যাণও সাধিত হইয়াছিল। যে দিন এইরূপ নিঃস্বার্থভাবে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্য পুনর্ব্বার চেষ্টা হইবে, সেইদিন ভারতের পুনরায় উন্নতির সূত্রপাত হইবে।

এই তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় কিরূপ পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা জানিতে অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে, তজ্জন্য এখানে তাহা উল্লিখিত হইল :—

প্রথম শ্রেণী—৪ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্যগ্রন্থ—কঠোপনিষৎ; রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থের চূর্ণক; তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা; ব্যাকরণ; পদার্থবিদ্যা; ভূগোল; অঙ্ক। English studies—Reader No 4; Poetical Reader No 2; Grammar; History of Bengal.

দ্বিতীয় শ্রেণী—১৪ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ—ব্যাকরণ; জ্ঞানার্ণব; ভূগোল; অঙ্ক। English studies—Reader No3; Poetical Reader No 1; Grammar; History of Bengal.

তৃতীয় শ্রেণী—২৪ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্যগ্রন্থ—বর্ণমালা ২ ভাগ; মনোরঞ্জন ইতিহাস; ভূগোল; অঙ্ক। English studies—Reader No 2; Spelling No 2.

* তত্ত্বঃ বোঃ পত্রিকা ১৭৬৬ শক, অগ্রহায়ণ।

চতুর্থ শ্রেণী—২০ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্যগ্রন্থ—নীতিকথা ২ ভাগ; বর্ণমালা ২ ভাগ; অঙ্ক। English studies—Reader No 1; Spelling No 2.

পঞ্চম শ্রেণী—২৯ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্যগ্রন্থ—নীতিকথা প্রথম ভাগ; বর্ণমালা প্রথম ভাগ; অঙ্ক। English studies —Easy Primer.

ষষ্ঠ শ্রেণী—৩৬ জন ছাত্র। বাঙ্গালা পাঠ্যগ্রন্থ—বর্ণমালা প্রথম ভাগ; অঙ্ক। Engish studies—Easy Primer.

পাঠশালা সংস্থাপিত হওয়া অবধি অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার শিক্ষকতায় নিযুক্ত হয়েন। পাঠশালার পাঠ্য পুস্তকাবলী তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইত। সভা পাঠশালার নিমিত্ত অক্ষয় বাবুর পদার্থবিদ্যা ও ভূগোল প্রকাশ করেন। পাঠশালা বাঁশবেড়িয়াতে স্থানান্তরিত হইলে অক্ষয় বাবু তথায় যাইতে অস্বীকার করায় শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ ৩০৲ টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া তথায় গমন করেন। ৺ রামগোপাল ঘোষ মহাশয় পাঠশালার পরিদর্শক নিযুক্ত হন। ছাত্রসংখ্যা একশতের অধিক ভর্ত্তি করা হইত না। এবং ১৪ বৎসরের অধিক বয়ঃক্রম কোন ছাত্রকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা যাইত না। *

এই পাঠশালার পরীক্ষাতে বঙ্গের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে প্রায় চারিশত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। তন্মধ্যে রামগোপাল ঘোষ,রমাপ্রসাদ রায়, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,শ্রীধর ন্যায়রত্ন, অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বান্ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। "বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সন্তুষ্ট হইয়া দুইজন ছাত্রকে বঙ্গভাষাতে নিপুণতার জন্য ২৫ পঞ্চবিংশতি মুদ্রা অতিরিক্ত পুরস্কার প্রদান করিলেন। ৩৯ জন ছাত্রকে পুরস্কার দেওয়া যায় তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর প্রধান ছাত্র শ্রীযুক্ত দীননাথ রায় ৩১ একত্রিশ মুদ্রা এবং বঙ্গ ও ইংলণ্ডীয় ভাষার কতকগুলিন পুস্তক প্রাপ্ত হয়েন, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান ছাত্র শ্রীযুক্ত বেচারাম মুখোপাধ্যায় ২২ দ্বাবিংশতি মুদ্রা ও কতকগুলি পুস্তক প্রাপ্ত হয়েন। অধিক আহ্লাদের বিষয় এই যে তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন এপ্রকার সুন্দর হইয়াছে যাহা এত অল্প দিনে সম্ভব হওয়া সহজ নহে।" * প্রথম শ্রেণীর ছাত্র দীননাথ রায় উক্ত বিষয়ক প্রশ্ন সকলের যে উত্তর লিখিয়াছে, তাহা আমরা অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মালোচনার ফল কিরূপ সহজে ফলিয়া থাকে। বৎসর তিন চারি জীবিত থাকিয়া পরে যখন হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন এই পাঠশালার অনাবশ্যকতাবোধে (এবং সম্ভবত অর্থাভাবে) ইহা উঠিয়া গেল।

ক্রমশঃ।

সেই পথের পথিক।

কোথা যাও? পান্থ! কোন্ তীর্থপানে
কাহার দর্শন তরে।
কোন্ সে জাগ্রত দেবতার পদে
কি ধন গো যাচিবারে॥
চলেছ ছুটিয়া হরষ আবেগে
একা কিগো সাথীহীন।
সম্মুখেতে তব প্রজ্জ্বলন্ত মরু
জ্বলিতেছে নিশিদিন॥

* নকুড় বাবু প্রণীত অক্ষয়চরিত।

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৬৬ শক, মাঘ।

না ভ্রুক্ষেপি তাহে চলিছ নীরবে
বল গো কিসের টানে।
সহিছ মরুর জ্বলন্ত যাতনা
কাহার আশ্বাস দানে ॥
পশ্চাতে তোমার মায়া কুহকিনী
ডাকিতেছে হেসে হেসে।
ধরিতে তোমায় মোহের পিঞ্জরে
জড়াইতে বাহুপাশে ॥
পদতলে তব অহরহ হায়!
কণ্টক বিঁধিছে কত।
বাসনার লতা জড়াইয়া পদে
বাধা দেয় অবিরত ॥
ওই যে তপন ডুবিল পশ্চিমে
এলো ঘোর অন্ধকার।
নিশীথের শত বিভীষিকা ঘোর
ঘেরে আসে চারিধার ॥
বল ওহে পান্থ! এ ঘোর আঁধারে
কিসের দেউটি জ্বলি।
নিয়ে যায় তোমা পথ দেখাইয়ে
আঁধারেরে অবহেলি ॥
কোন্ মহাবিশ্ব মন্দিরের মাঝে
আহ্বানের ঘণ্টাধ্বনি।
ডাকিতেছে তোমা সুগভীর স্বরে
আকুল হয়েছ শুনি ॥
নয়নেতে তব পড়েছে আসিয়া
কোন্ দূর তীর্থছায়া।
আননে তোমার কোথাকার আলো
পড়িতেছে উছলিয়া ॥
সর্ব্বাঙ্গে তোমার কোথাকার বায়ু
পুলক ছড়ায় দেয়।
কোথাকার মহা হরষ বারতা
তোমারে ঘেরিয়া গায় ॥
বাঁধিতে তোমায় স্নেহ আলিঙ্গনে
কেও ডাকে আয়! আয়!
কার সকরুণ আশীর্ব্বাদ বাণী
ধ্বনিছে আকাশ ময় ॥
ধরিতে কেন গো মহা জলধিরে
ও ক্ষুদ্র হৃদয়াধারে
তুমি গো তটিনী ধাও মহোল্লাসে
না চাহিয়া কোন ধারে ॥
কোন্ নিরাপদ বন্দরের পানে
তুমি হে তরণী ধাও।
কোন্ হে সূর্য্যের মহা আকর্ষণে
তুমি গ্রহ ছুটে যাও।

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

ষোড়শ প্রস্তাব।

আরণ্যকাণ্ড।

মায়ামৃগবধ ও সীতাহরণ।

রাম সীতার (অধ্যাত্মরামায়ণকারের মতে মায়াসীতার) আগ্রহাতিশয়ে ধনুর্ব্বাণ হস্তে মৃগের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন ও তীক্ষ্ণ সায়ক সন্ধানে অচিরে তাহার মর্ম্মস্থল বিদারণ করিলেন। মারীচ কৃত্রিম মৃগরূপ পরিত্যাগ করিয়া রাক্ষসমূর্ত্তি ধারণ করিল ও রামের অনুরূপ স্বরে হা সীতা হা লক্ষ্মণ বলিয়া চীৎকার করত গতাসু হইল। সে শব্দে রাম শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার মন বিষণ্ণ হইয়া গেল। তিনি মৃগবধ প্রসঙ্গে বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছিলেন এক্ষণে দ্রুতপদে আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

এদিকে জানকী রামের আর্ত্তরব শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বুঝি আর্য্যপুত্রের কি দুর্ঘটনা হইল, আমি তাঁহার ক্রন্দন রব সুস্পষ্ট শুনিয়াছি, আমার প্রাণ আকুল হইতেছে। তুমি গিয়া তাঁহাকে রক্ষা কর। লক্ষ্মণ সীতাকে একাকী ফেলিয়া যাইতে কোন মতেই সম্মত হইলেন না। তিনি রামের বলবীর্য্য বিলক্ষণ জানি-

তেন। তখন সীতা নিতান্ত ক্রুদ্ধা হইয়া কহিলেন লক্ষ্মণ! এ অবস্থাতেও তুমি রামের সন্নিহিত হইলে না, জানিতেছি তুমি তাঁহার মিত্ররূপী শত্রু, তুমি আমাকে পাইবার জন্য তাঁহার মৃত্যু কামনা করিতেছ। আমারই লোভে তাঁহার নিকট গমন করিলে না। লক্ষ্মণ সীতাকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাঁহার বাক্যযন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া দীনমনে রামের সন্ধানে বহির্গত হইলেন। রাবণ অদূরে থাকিয়া অবসর অনুসন্ধান করিতেছিল। এক্ষণে সুযোগ বুঝিয়া সীতাকে হরণ করিয়া মায়াময় রথে আকাশ-পথে উত্থিত হইল। সীতা কুররীর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

পথমধ্যে গিরিশৃঙ্গাকার প্রখরতুণ্ড জটায়ুর সহিত রাবণের সাক্ষাৎ হইল। তিনি রাবণের বিসদৃশ আচরণে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণ তাহাকে পরাস্ত করিয়া পম্পা নদী অতিক্রম পূর্ব্বক লঙ্কায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

রাম ব্যাকুল হইয়া আশ্রমের দিকে আসিতেছেন, অরণ্যমধ্যে লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি লক্ষ্মণকে দেখিয়া কাতরতার সহিত কঠোর স্বরে কহিলেন সীতাকে রাখিয়া আগমন করা গর্হিত হইয়াছে। চারিদিকে দুর্নিমিত্ত দেখিতেছি, বোধ হয় সীতা অপহৃতা হইয়া থাকিবেন। অথবা রাক্ষসেরা তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। লক্ষ্মণ সমুদয় ঘটনা রামকে নিবেদন করিলেন। তাঁহারা সত্বরে আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সীতাকে দেখিতে না পাইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কতই অনুসন্ধান করিলেন তথাপি জানকীর দর্শন পাইলেন না। রাম শোক ভারে মুহ্যমান হইয়া লক্ষ্মণের সহিত অরণ্যানী পর্য্যটন করিতে করিতে জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহারই মুখে সীতাহরণ শ্রবণ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন। রক্তস্রাবে জটায়ু নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। তাঁহারা জটায়ুর অগ্নিক্রিয়া সমাপনান্তে সীতার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। বহুদূর আসিয়া অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন এমন সময়ে কবন্ধ আসিয়া তাঁহাদিগকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল। রাম ও লক্ষ্মণ তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে তাহাকে বিনষ্ট করিলেন। চিতাবিদগ্ধ কবন্ধদেহ হইতে এক দিব্যাম্বরধারী পুরুষ উত্থিত হইয়া রামকে কহিল তুমি ঋষ্যমূকবাসী সুগ্রীবের সহিত সখ্য স্থাপন কর। সীতা উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি তোমার সহায় হইবেন। রাম লক্ষ্মণ কবন্ধনির্দ্দিষ্ট পথে যাইতে যাইতে তাপসী শবরীর আশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাপসী তাঁহাদের যথোচিত সৎকার সমাপনান্তে অগ্নিকুণ্ডে নিজ দেহ আহুতি প্রদান করিলেন এবং যথায় পুণ্যশীল মহর্ষিরা বিহার করিতেছেন সমাধিবলে সেই পবিত্রলোকে গমন করিলেন। রামও লক্ষ্মণের সহিত পম্পা দর্শনে উৎসুক হইয়া বহির্গত হইলেন এবং অচিরাৎ ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আসিয়া পৌঁছিলেন। এইখানে আরণ্যকাণ্ডের সমাপ্তি হইল।

কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণকার ঘরগড়া রামায়ণ লিখিতেছিলেন। আরণ্যকাণ্ডের ৮ম অধ্যায়ে আছে রাম মায়ামৃগরূপধারী মারীচকে বিনাশ করিয়া আসিতেছেন পথমধ্যে দূর হইতে লক্ষ্মণকে দেখিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, আমি যে মায়া-সীতা করিয়াছি লক্ষ্মণ তাহা জানে না। আমি প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় ইহাকে বঞ্চনা করিয়া (প্রকৃত ব্যাপার জানিতে না দিয়া) শোক করি। যদি শোক না করিয়া স্থিরভাবে আশ্রমে বসিয়া থাকি তবে আর কবে রাক্ষসকুল নির্ম্মূল হইবে। যদি এখন কামুক পুরুষের ন্যায় শোক করিতে আরম্ভ করি তাহা হইলে সীতার অনুসন্ধানছলে ক্রমে রাক্ষসালয়ে গমন করিতে পারিব এবং রাবণকে সবংশে বি-

নাশ করিয়া অগ্নিমধ্যে মৎকর্ত্তৃক স্থাপিতা সীতাকে লইয়া অযোধ্যায় গমন করিব। আমি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া মনুষ্যরূপে জন্মিয়াছি। কিছুদিন মনুষ্যভাবেই বাস করিব। এরূপ নিশ্চয় করিয়া লক্ষ্মণকে ভৎর্সনা করিয়া আশ্রমে আসিয়া সীতাকে না দেখিতে পাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ইহার পরে আছে জটায়ু রামকে দেখিয়া সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে জগন্নাথ, আমি প্রাণত্যাগ করি তুমি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হও। রাম নিজ করে জটায়ুকে স্পর্শ করিলেন এবং কহিলেন জটায়ু! সকলে দেখুন তুমি আমার স্বারূপ্য প্রাপ্ত হও। অধ্যাত্ম রামায়ণোল্লিখিত জটায়ুকর্ত্তৃক রামের স্তব ভাবা ও ভাবে অতীব সুন্দর, তাহা আমরা পাঠকগণকে দেখিতে অনুরোধ করি। শাপমুক্ত কবন্ধের স্তব বড়ই মনোরম। এখানে, অধ্যাত্ম রামায়ণকার এক বিরাটমূর্ত্তির ছবি দিয়াছেন তাহা অন্যান্য শাস্ত্রে নিতান্তই বিরল। বলিতে কি, অধ্যাত্ম রামায়ণকার অবসর পাইলেই ভগবানের স্তোত্র ও তত্ত্ব কথা সমধিক সন্নিবেশ সম্বন্ধে এমনই কুশলী যে মূল রামায়ণের সহিত ইতিহাসগত পার্থক্য ও ইহাতে স্বকপোল কল্পনার বিমিশ্রণ থাকিলেও সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রে অধ্যাত্ম রামায়ণ একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন। শবরীকে সম্বোধন করিয়া রাম বলিতেছেন যে মৎভক্তির উপায় তোমায় কহিতেছি।

সতাং সঙ্গতিরেবাত্র সাধনং প্রথমং স্মৃতং
দ্বিতীয়ং মৎকথালাপস্তৃতীয়ং মৎগুণেরণম্
ব্যাখ্যাতৃত্বং মৎবচসাং চতুর্থসাধনং ভবেৎ
আচার্য্যোপাসনং ভদ্রে মৎবুদ্ধ্যা মায়য়া সদা
পঞ্চমং পুণ্যশীলত্বং যমাদিনিয়মাদি চ
নিষ্ঠা মৎপূজনে নিত্যং ষষ্ঠং সাধনমীরিতম্
মম মন্ত্রোপাসকত্বং সাঙ্গং সপ্তমমুচ্যতে
বাহ্যার্থেষু বিরাগিত্বং শমাদিসহিতং তথা
অষ্টমং নবমং তত্ত্ববিচারো মম ভামিনি।
এবং নববিধা ভক্তিঃ।

১ম সৎসঙ্গ, ২য় ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা, ৩য় ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন, ৪র্থ ঈশ্বরের গুণব্যাখ্যা, ৫ম গুরুভক্তি, ৬ষ্ঠ পুণ্যশীলতা অর্থাৎ বিশুদ্ধভাব, সংযমাদি ও ঈশ্বরের নিত্য পূজা, ৭ম মন্ত্রোপাসনা অর্থাৎ মন্ত্র জপ, ৮ম বাহ্যবিষয়ে বিরাগ ও শমাদি সাধন, ৯ম ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ ভক্তিসাধনের এই ৯টি উপায়।

ক্রমশঃ

শান্তিনিকেতন।

বৃক্ষ-জটাজাল ল'য়ে আশ্রম বিজন—
সুধাময় আমলকে তরুশাখা ভ'রে,
অর্ঘ্য লয়ে দাঁড়ায়েছে অতিথির তরে;—
পুষ্পবাসে সমীরিত ঋষির স্বপন।
ভুবন-প্রান্তর মাঝে শোভে অভ্রভেদী
সমুচ্চ ব্রহ্মমন্দির; একাক্ষর ওম
শিখরে জ্বলিছে শুভ্র,আলো করি' ব্যোম;
সম্মুখে সুদীর্ঘ বাহু শালবৃক্ষ পরে
বিহগেরা সুমঙ্গল স্তুতি গান করে;
চিরমৌন সুপ্রশান্ত ব্রহ্মতীর্থ মাঝে
নিশিদিন সুগম্ভীর বেদধ্বনি বাজে;
সপ্তচ্ছদ ছায়াতলে পরিশুভ্র বেদী-
পরে বসি' পদ্মাসনে, শুনি শুভক্ষণে
প্রকৃতির শান্তি পাঠ শান্তি নিকেতনে।

প্রেরিত পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ
শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক
মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু।

প্রিয়বর মহাশয় নমস্তে! এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করাইতেছি যে শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলিকাতা আর্য্য সমাজের সভ্য নহেন। তিনি অন্য কোন স্থানের আর্য্য সমাজের সভ্য কি না? তাহাও আমরা জানি না। আমাদিগের সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজের অতি সামান্য বিষয়ের মতভেদ আছে। আপনাদিগের প্রধান আচার্য্য ভক্তিভাজন শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে আমরা সকলে প্রাণের সহিত পরমভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে ভালবাসি। ঈশ্বর উপাসনা ও ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ বিষয় ইত্যাদি আমাদিগের সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মতভেদ নাই বলিলেই হয়। সারদা বাবু যদি কিছু আদি ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে আর্য্য সমাজের মত বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন তবে তাহা আর্য্য সমাজের বিশেষতঃ কলিকাতা আর্য্য সমাজের মত বলিয়া গ্রহণ করিবেন না।

আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী
মহাবীর প্রসাদ।
কলিকাতা আর্য্য সমাজের
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭, আশ্বিন মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৬৮১৸৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	২৩৪০৷৴৯
সমষ্টি	৩০২২৷ ৯
ব্যয় ...	১০২২৸৵৬
স্থিত ...	১৯৯৯৷৵৩

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
১৪৫৭৻৯
নফে উক্ত মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
৫০০৲

	১৯৫৭ ৻৯
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত ...	৩৫৷৴৬
	১৯৯৯৷৵৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ২৪৬৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	২০০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়	১০৲
" " অনঙ্গমোহন রায় চৌধুরী	৫৲
" " হরকুমার সরকার	২৲
	১৭৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	১০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষীনারায়ণ বেজবরুয়া	২৲
" " শরচ্চন্দ্র চৌধুরী	১৲
" " প্রাণকৃষ্ণ সরকার	১৲
	৪৲
পুরাতন কড়িকাঠ বিক্রয়ের মূল্য	১৫৲
	২৪৬৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ১১৭৴০

শ্রীমতী রাণী হেমন্তকুমারী দেবী, পুঁটিয়া	৩৷৵০
শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ চৌধুরী, বোয়ালিয়া	৩৲
" " শ্যামলাল মিত্র, লক্ষ্ণৌ	৩৷৵০
" " কৃষ্ণদয়াল সিংহ চৌধুরী, রাজগঞ্জ	৬৸০
" " মহাশয় কৈলাসচন্দ্র রায়, দেহড়দা	৬৵০
" " চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত, পাণ্ডুয়া	৩৷৵০
" " কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, রাজগঞ্জ	৩৷৵০
" " ভবদেব নাথ, কালনা	২৲
" " হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, মাহাটা	১৲
" " চন্দ্রশেখর বসু, দ্বারভাঙ্গা	৬৸০
" " হরকুমার সরকার, ঘোড়ামারা	৬৸০
" " কালীনাথ চৌধুরী, চুঁচুড়া	৪৲
" " ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ভবানীপুর	৬৲
" " গিরিজাশঙ্কর মজুমদার, ঐ	৩৲
" সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ, মেদিনীপুর	৩৷৵০
" " ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীরামপুর	৷৴০
" " পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ, ঢাকা	৸০
" বাবু হরিমোহন নন্দী, কলিকাতা	২৲
" " ক্ষেত্রমোহন ধর, ঐ	৩৲
" " গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ঐ	৩৲
" " হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়, ঐ	১৲
" " আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, ঐ	১৲
" " গোবিন্দলাল দাস, ঐ	৩৲
" " অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়, ঐ	৩৲
" " গোপালচন্দ্র দে, ঐ	১৲
" " কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস, ঐ	৩৲
" " বিপিনবিহারী সরকার, ঐ	৩৲
" " ব্রজনাথ দত্ত, ঐ	৩৲
" রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ঐ	৩৲
" মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা বাহাদুর, ঐ	৩৲
" বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু, ঐ	১৷০
" " লালবিহারী বড়াল, ঐ	৩৲
" " তুলসীদাস দত্ত, ঐ	৩৲
" " কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ঐ	৩৲
" " জানকীনাথ মজুমদার, ঐ	৩৲
" " কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী, ঐ	৩৲
" " দেবেন্দ্রদেব দাস, ঐ	৩৲
" " সুরেশচন্দ্র দত্ত, ঐ	২৲
	১১৭৴০

পুস্তকালয়	৬৸৵০
যন্ত্রালয়	৩১১৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	১৲
সমষ্টি	৬৮১৸৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৩৪৮৷৶১
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৪৩৸৵৩
পুস্তকালয় ...	৪১৴০
যন্ত্রালয় ..	৩৪৫৷৵০
গচ্ছিত	২৪৩৸৵৩
সমষ্টি	১০২২৸৵৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৭, কার্ত্তিক মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩০২৸৶৩
পূর্ব্বকার স্থিত	...	১৯৯৯৷৶৩
সমষ্টি	...	২৩০২৷৴৬
ব্যয়	..	৭০৷৴৬
স্থিত	...	২২৩২৲

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	১৪৫৭৻৯
দফে উক্ত মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
	১৯৫৭৻৯
হাওলাত: শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	২৬৭৸৶৩
	২২৩২৲

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৮৸০

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	১০৲

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী	৫৲
পুরাতন কড়িকাষ্ঠ বিক্রয়ের মূল্য	৩৸০
	১৮৸০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩২৷৶০

শ্রীরাজ জি, এন্, গজপতি রাও, সি, আই, ই	ভিজাগাপাটম	৩৷৶০
শ্রীযুক্ত রাজা কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র বাহাদুর,	গড় খণ্ডরই	৩৷৶০
" লালা গণেশপ্রসাদ,	রাজ দ্বারভাঙ্গা	৩৷৶০
বড়িষা আত্মোন্নতি সভা,	বড়িষা	১৷০
শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র সিংহ,	কলিকাতা	৩৲
" " আশুতোষ ধর,	ঐ	৩৲
" " বলাইচাঁদ পাইন	ঐ	৩৲
" " মণিলাল মল্লিক,	ঐ	৩৲
" " হেমলাল পাইন,	ঐ	৩৲
" " কন্নূলাল বর্ম্মন্,	ঐ	৩৲
" " উমেশচন্দ্র দেব,	ঐ	৩৲
		৩২৷৶০

পুস্তকালয়	...	৭৷৶০
গচ্ছিত	...	২৪৪৶৩
সমষ্টি		৩০২৸৶৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৮৻৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৫৷৴৯
পুস্তকালয়	...	৶৬
যন্ত্রালয়	...	১৭৴০
সমষ্টি	...	৭০৷৴৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

সপ্তষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহের জীর্ণসংস্কার সুসম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ১১ মাঘের প্রাতঃকালীন ব্রহ্মোপাসনা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইয়া আসিতেছিল এ বৎসর হইতে তাহা রহিত হইয়া এই আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহেই হইবে। অতএব ঐদিবস প্রাতে ৮ঘটিকার সময়ে ব্রহ্মোপাসনার জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহেই সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীমৎদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রাতে বেদি গ্রহণ করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আগামী ৫ই পৌষ শনিবার অপরাহ্ন ৭৷৷ সাড়ে সাত ঘটিকার সময় বলুহাটী সারস্বত আশ্রমের উনচত্বারিংশ উৎসব ও তদুপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা হইবেক।

শ্রী মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দ্দশ কল্প।

দ্বিতীয় ভাগ।

মাঘ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।

৬৪৭ সংখ্যা ১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

...ন।

...রিক

...জীর্ণ-

...। পূর্ব্ব

...প্রাতঃ-

...শ্রীমৎ প্রধান

...বাটীর বহিঃ-

প্রাঙ্গনে ... আসি... ছিল এ

বৎসর হইতে তাহা রহিত হইয়া

এই আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহেই হইবে।

অতএব ঐ দিবস প্রাতে ৮ ঘটিকার সময়ে ব্রহ্মোপাসনার জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহেই সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীমৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রাতে বেদি গ্রহণ করিবেন।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রী ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে ... আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ।

হে ...ন্মাগণ!

...মাঘের শুভ উৎসব দিনে তোমর... লে সংযম অবলম্বন করিও এবং আমিষ আহার পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধাচারে থাকিও। এই উৎসবের দিনে আমিষ আহার পরিত্যাগ করিয়া সংযম পূর্ব্বক শুদ্ধাচারে থাকাই প্রকৃষ্ট বিধি। তোমরা এইরূপ বিধি অবলম্বন করিলে ব্রহ্মোৎসবের পবিত্রতা সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইবে।

শান্তিনিকেতনে ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

৭ই পৌষ ৬৭ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

প্রাতঃকালে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। তখন আমরা সকলে প্রস্তুত হইয়া "অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি" এই সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে ব্রহ্মমন্দির প্রদক্ষিণ করিলাম। সুপ্রশস্ত মাঠ, সিন্দূররাগরক্ত সূর্য্য, নির্ম্মল সুশীতল বায়ু, মন্দিরের সম্মুখস্থ এক একটী অঞ্জলিপ্রমাণ সুগন্ধি গোলাপ পুষ্প, উদ্যান বৃক্ষস্থ পক্ষিদিগের কোলাহল, সমস্ত মিলিয়া মন উন্মত্ত করিয়া তুলিল। আমরাও ব্রহ্মোপাসনার জন্য মন্দিরে গিয়া উপবিষ্ট হইলাম।

অনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত প্রকারে উদ্বোধন করিলেন।

এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড যখন ঘো[illegible] কারে আচ্ছন্ন ছিল, এই শোভন [illegible] তের চিহ্নমাত্রও যখন ছিল না, [illegible] বিশ্বাধিপতি জ্যোতির্ম্ময় জাগ্রত [illegible] ইচ্ছাতে কোটি কোটি সূর্য্য চন্দ্র [illegible] প্রকাশিত হইয়া এই বিশ্বভুবন [illegible] আলোকে আলোকিত করিয়া [illegible] ছিল। "না ছিল এসব কিছু, আঁ[illegible] অতি ঘোর দিগন্ত প্রসারি; ইচ্ছা [illegible]ইল [illegible]ব ভানু বিরাজিল, জয় জয় মহিমা তোমারি।" আজ সেই জাগ্রত দেবতা এই [illegible]ন্তরমধ্যস্থিত ব্রহ্মমন্দিরে সমবেত ভক্ত[illegible]গণের সম্মুখে আমাদের সকলের [illegible]য়োত্থিত প্রীতিকুসুম গ্রহণ করিবার [illegible]ন্ত শুদ্ধমপাপবিদ্ধং জ্যোতির্ম্ময়রূপে [illegible]র্ভূত হইয়াছেন। তিনি আমাদের [illegible]কের অন্তরে থাকিয়া শুভ কামনা সমূহ প্রেরণ করিতেছেন এবং তিনিই প্রত্যেক ঘটনাকে জগতের মঙ্গলের জন্য নিয়মিত করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছাতে স্রোতস্বতী নদী সকল নগর গ্রাম সমূহকে উর্ব্বর ও শস্যশ্যামল করিয়া, সাগরোত্থিত মেঘরাশি দেশদেশান্তরকে সিক্ত করিয়া, ফলপুষ্পভারে অবনত বৃক্ষলতা সকল ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত জনগণের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করিয়া যেমন পৃথিবীর মঙ্গলসাধনে নিরত রহিয়াছে, সেইরূপ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, ভূমিকম্প ইহারা সকলেও সেই মহান্ সত্যসুন্দর পুরুষে[illegible] স্থলে আবদ্ধ থাকিয়া জগতের [illegible] করিতেছে। দুর্ভিক্ষ, মহ[illegible] আপাতত আমাদে[illegible] প্রসূ বলিয়া বে[illegible] অন্তর্নিহিত মঙ্গল[illegible] চক্ষে প্রা[illegible]

[illegible]

[illegible]াদে[illegible] পৃথিবীতে জন্ম[illegible]ণ করিলাম, জন্মগ্রহণ করিয়া এতদিন [illegible]চিয়া রহিলাম; যাঁহার মঙ্গল-ইচ্ছাতে [illegible]শৈশবে মাতৃস্নেহ দুগ্ধধারারূপে বিগলিত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিল এবং যাঁহার করুণায় আমরা পৃথিবীর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পদার্থ সকল দেখিয়া শুনিয়া ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিলাম, আপনাদিগকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত করিতে পারিলাম, সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গলমূর্ত্তি কি এতদিনে[illegible]